POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ
اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا (النساء:125)

এবং যে কেহ সৎকাজ করে, নর হউক বা নারী এবং সে মো'মেন–এই প্রকারের ব্যক্তিগণ জান্নাতে প্রবেশ করিবে, এবং তাহাদের উপর খর্জুর আঁটির ছিদ্র পরিমাও অন্যায় করা হইবে না।

(আন–নিসা:১২৫)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 7

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 7

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 17 ফেব্রুয়ারী, 2022 15 রজব 1443 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

বারিরার জন্য সদকা, কিন্তু আমাদের জন্য উপহার

১৪৮০) হযরত আনাস (রা.)–এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা.) –এর কাছে মাংস নিয়ে আসা হয় যা বারিরা (রা.) কে সদকা হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। আঁ হযরত (সা.) বললেন, 'তার জন্য সদকা হলেও আমার জন্য এটি উপহার।'

নিপীড়িতের অভিশাপ এড়িয়ে চল, কেননা তার এবং আল্লাহ্‌র মাঝে কোন অন্তরায় নেই।

১৪৯৬) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)–এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) হযরত মাআজ বিন হাবাল (রা.)কে যখন ইয়েমেনে প্রেরণ করেন, তখন তিনি তাকে বলেন, তুমি এমন জাতির দিকে যাচ্ছ যারা আহলে কিতাব। তাদের কাছে পৌঁছে তাদের কাছ থেকে এই সাক্ষ্য গ্রহণ করো যে আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মহম্মদ আল্লাহ্‌র রসুল। যদি তারা তোমার কথা মেনে নেয়, তবে তুমি তাদেরকে বলে,'আল্লাহ্ তোমাদের জন্য দিন ও রাত্রিতে পাঁচ ওয়াক্তের নামায ধার্য করেছেন। যদি তারা তোমার কথা মেনে নেয়,তবে তাদেরকে বলো, 'আল্লাহ্ তাদের জন্য সদকাও (যাকাত প্রদান) বিধিবদ্ধ করেছেন যা তাদের ধনবানদের কাছ থেকে নেওয়া হবে এবং অভাবীদেরকে দেওয়া হবে। যদি তারা তোমার এই কথা মেনে নেয়, তবে একথা মাথায় রেখো! তাদের উৎকৃষ্ট সম্পদগুলি নিও না এবং নিপীড়িতের অভিশাপ এড়িয়ে চল, কেননা তার এবং আল্লাহ্‌র মাঝে কোন অন্তরায় নেই।

(বুখারী, কিতাবুয যাকাত)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ১৪ জানুয়ারী, ২০২২
হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত নিউজিল্যাণ্ড, ২০১৩ (সেপ্টেম্বর),
প্রশ্নোত্তর (পত্রাদি, বৈঠক প্রভৃতির সংকলন)
হুযুরের সঙ্গে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের বিবরণ

মানুষ যখন 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু' উচ্চারণ করে তখন সে শুধু খোদাকেই দেখে, খোদা ছাড়া সব কিছু তার দৃষ্টিতে মূল্যহীন হয়ে পড়ে। সেই কারণে সে বীরত্বের সঙ্গে কাজ করে এবং কোনও ব্যক্তি বা বস্তু তাকে ভয়ভীত করতে পারে না।"

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর বাণী

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: মুসলমানদেরকে দিনরাত কলেমা তৈয়্যবা পাঠ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে, এর কারণ হল এটি ছাড়া মানুষের মাঝে বীরত্ব ও সাহসিকতা তৈরী হতে পারে না। মানুষ যখন 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু' উচ্চারণ করে,তখন সমস্ত মানুষ, বস্তুনিচয়, প্রশাসক,অফিসার, শত্রু ও মিত্রের শক্তি তার কাছে তুচ্ছ বলে প্রতীয়মান হয়। আর তখন সে শুধু খোদাকেই দেখে, খোদা ছাড়া সব কিছু তার দৃষ্টিতে মূল্যহীন হয়ে পড়ে। সেই কারণে সে বীরত্বের সঙ্গে কাজ করে এবং কোনও ব্যক্তি বা বস্তু তাকে ভয়ভীত করতে পারে না।"

অন্তর্দৃষ্টি

অন্তর্দৃষ্টিও একটি মূল্যবান গুণ। যেমনটি সেই ইহুদী হযরত রসুল করীম (সা.)কে দেখে বলেছিল, 'আমি এই ব্যক্তির মাঝে নবুয়তের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি।' অনুরূপভাবে মোবাহালার (প্রার্থনা–দ্বৈত) সময় খৃষ্টানরা হযরত রসুল করীম (সা.) –এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আসে নি। কেননা তাদের পরামর্শদাতা তাদেরকে বলেছিল যে, আমি এমন মুখ দেখতে পাচ্ছি যা পর্বতকে আদেশ করলে পর্বতও স্থানচ্যুত হবে।" তিনি (আ.) বলেন: কারো মধ্যে আধ্যাত্মিকতার লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকলেও সে আমাকে গ্রহণ করবে।"

উপদেশবাণীমূলক পুস্তক লেখার বাসনা

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন–

আমার বাসনা, একটি উপদেশবাণীমূলক পুস্তক লিখি আর মৌলবী মহম্মদ সাহেব সেটির অনুবাদ করুক। এই পুস্তকের তিনটি অধ্যায় হবে। প্রথম অধ্যায়টি হবে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আমাদের কর্তব্য কি– সেই বিষয়ে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে থাকবে আমাদের নিজের প্রাণের প্রতি কি কি অধিকার রয়েছে, তার বিষয়ে। আর তৃতীয় অধ্যায়টি হবে মানবজাতির প্রতি আমাদের অধিকার সমূহ কি কি তার বিষয়ে।"

সাধু–পুরুষদের নিদর্শনসমূহ।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: নবুয়তের যুগকে 'নুরুন আলা নুর' (জ্যোতির উপর জ্যোতি) নামে অভিহিত করা যেতে পারে। সেটি ছিল মধ্য–গগনের রবি। কিন্তু এর পরবর্তী যুগে যে সমস্ত অলৌকিক নিদর্শন ও বিস্ময়কর কর্মকাণ্ড তাদের প্রতি আরোপিত করা হয়েছে সেগুলি প্রমাণিত নয়। আর সেগুলির ইতিহাস সম্পর্কেও সঠিকভাবে জানা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.)–এর অলৌকিক নিদর্শনাবলীর কাহিনী তাঁর মৃত্যুর দুই শত বছর লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাছাড়া তাদেরকে সেই সব শত্রুদের এবং প্রতিকুলতার বিরুদ্ধেও লড়াই করতে হয় নি, যেমন বিপদাপদের সম্মুখীন আমাকে হতে হয়েছে।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০১৮)

তোমরা যাদের উপাসনা কর তারা সকলে মৃত্যু বরণ করেছে। তারা কিভাবে পথপ্রদর্শনকারী হতে পারে! খোদা হওয়ার জন্য স্রষ্টা হওয়া আবশ্যিক শর্ত।

وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ○ اَمْوَاتٌ
غَيْرُ اَحْيَآءٍ ۚ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۙ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ○

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)সূরা নহলের ২১ ও ২২ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: স্রষ্টা হওয়া ছাড়া অদৃশ্যের সংবাদ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায় না। একমাত্র স্রষ্টাই পারেন তার সৃষ্টির অভ্যন্তরের শক্তিসমূহ ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত থাকতে, তিনি ছাড়া অন্য কেউ অবগত থাকতে পারে না। আর যদি কেউ অবগত হয়, তবে সেও অনুরূপ স্রষ্টা হয়ে উঠবে। কিন্তু যাকে তোমরা উপাস্যের স্থানে বসিয়েছ, তারা স্রষ্টা নয়, বরং তারা সকলকেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

খোদা তা'লা ছাড়া কেউ অদৃশ্যের সংবাদ জানতে পারে এমন সত্তার দাবিকে এই আয়াতের দ্বারা সূক্ষ্ম কৌশলে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, মুসলমানদের মধ্যে এই শিক্ষা বিদ্যমান থাকতেও এক শ্রেণীর মানুষ ধারণা করে ব বসে আছে যে, হযরত ঈসা (আ.) অদৃশ্যের সংবাদও জানতেন আর তিনি পাখিও সৃষ্টি করতেন। অথচ আল্লাহ্ তা'লা এখানে স্পষ্ট বাক্যে বলছেন, আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া যতগুলি সত্তার উপাসনা করা হয়, সেগুলি মধ্যে একটিও কোন কিছু সৃষ্টি করার শক্তি রাখে না। হযরত ঈসা (আ.) সেই সমস্ত সত্তার অন্তর্ভুক্ত যাকে লক্ষ কোটি মানুষ উপাসনা করে।

স্রষ্টা হওয়ার পাশাপাশি পথপ্রদর্শনকারী সত্তার জন্য

এরপর ৮ পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

বি:দ্রঃ- সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

(হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলী অন্তত তিন বার অধ্যয়ন করা উচিত। এ সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরের শেষাংশ)

তাই একথা যদি সঠিক হয় যে, যে-ব্যক্তি হুযুর (আ.)-এর সমস্ত পুস্তক তিন বার পড়ে না সে তাঁর দাবি সম্পর্কে অনুধাবন করতে পারেনা, তবে তিনি (আ.) হাকীকাতুল ওহী পুস্তকটি একবার মনোযোগ দিয়ে পড়ার কথা বলতেন না, বরং অন্যান্য পুস্তকের ন্যায় এটিকেও তিন বার পড়ার উপদেশ দিতেন।

হুযুর (আ.) নিজে কখনও একথা লেখেন নি, তবে সীরাতুল মাহদীতে একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে যে,' হযরত সাহেব বলতেন, যে ব্যক্তি আমার পুস্তকগুলি অন্তত তিন বার পড়ে না, তার মধ্যে এক প্রকার আত্মম্ভরিতা পাওয়া যায়। '

(সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৬৫, রেওয়ায়েত নম্বর-৪১০)

আর রেওয়ায়েতরও সেই একই অর্থ যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ ধর্মীয় পুস্তক বাদ দিয়ে কেবল জাগতিক জ্ঞান অর্জন মানুষের অহংকারকে প্রতিবিম্বিত করে। অতএব প্রত্যেক আহমদীর উচিত আধ্যাত্মিক জ্ঞানভাণ্ডার থেকে বেশি করে লাভবান হওয়া।

প্রশ্ন: এক ভদ্রমহিলা জানতে চান যে খুতবা জুমার শেষে ইমাম বসে পড়ে এবং পুনরায় উঠে দাঁড়িয়ে খুতবা সানিয়া পড়ে। এমনটি করার কারণ কি?

২০২০ সালের ২৩ শে ফেব্রুয়ারী তারিখের চিঠিতে হুযুর আনোয়ার বলেন: এটি আঁ হযরত (সা.)-এর সুন্নত বা রীতি ছিল। হাদীসগ্রন্থগুলিতে খুতবা জুমআ প্রদানের হুযুর (সা.) এর এই রীতির কথা বর্ণিত হয়েছে যে প্রথমে তিনি দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। এরপর উপদেশ দেওয়ার পর কয়েক মুহূর্তের জন্য নীরবে নীচে বসতেন অতঃপর উঠে দাঁড়িয়ে খুতবা সানিয়া পাঠ করতেন। এর কারণ হিসেবে কতিপয় উলেমা বর্ণনা করেছেন যে, হয়তো এর দ্বারা দুই খুতবায় পার্থক্যকে স্পষ্ট করাকে বোঝানো হয়।

কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, যদি কোন ইমাম কোন অপারগতার কারণে বসতে না পারেন, তবে প্রথম খুতবা দেওয়ার পর কয়েক মুহূর্ত নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে তার পর খুতবা সানিয়া পড়তে পারেন। যেমনটি হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রহ.) করতেন, যখন তিনি ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ার কারণে নীচে বসতে পারতেন না। সেই সময় তিনি প্রথম খুতবা দেওয়ার পর কয়েক মুহূর্ত নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং তারপর খুতবা সানিয়া পড়তেন। আমারও পিত্তথলির অপারেশন হয়েছিল, এর পর যে প্রথম জুমা ছিল, তার খুতবার সময় আমিও এই রীতি অবলম্বন করেছিলাম। কয়েক মুহূর্ত নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে খুতবা সানিয়া পাঠ করেছিলাম।

প্রশ্ন: আহমদী মেয়েদের অ=আহমদী ও অমুসলিম ছেলেদের সঙ্গে বিয়ের অনুমতি দেওয়া নিয়ে উদ্বিগ্ন জনৈক জামাতী পদাধিকারী হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে নিজের উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করে এ সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা চেয়েছেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০২০ সালের ২৯ শে ফেব্রুয়ারী তারিখের চিঠিতে লেখেন-

ইসলামের কিছু আদেশাবলী ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত, যেগুলির বিষয়ে খোদা তা'লা সাধারণ মুসলমানদেরকে কোনও প্রকার পরিবর্তন করার অধিকার দেন নি। কিন্তু তাঁর নবী এবং নবীদের প্রতিনিধি খলীফাদেরকে সেই বিষয়গুলিতে পরিবর্তন করার এবং পরিস্থিতি সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার দিয়েছেন।

আমার মতে মুসলমান পুরুষ ও মহিলাদের অমুসলিমদের সঙ্গে বিয়ের বিষয়টিও সেই ধরণের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই আহমদী পুরুষ বা মহিলাদের কোনও অ-আহমদী বা অমুসলিমের সঙ্গে বিয়ের অনুমতির বিষয়টি যুগ-খলীফার পরামর্শের উপর নির্ভরশীল। অন্য কারো কাছে এর অধিকার নেই। যুগ খলীফা প্রতিটি বিষয়ের পরিস্থিতি অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আমার কাছে যখন অনুমতি নেওয়ার জন্য যোগাযোগ করা হয়, তখন আপনাদের কাজ হল নিজের মতামত জানিয়ে আমাকে রিপোর্ট পাঠানো। এর চেয়ে বেশি আপনাদের কাজ নেই।

প্রশ্ন: হুযুর আনোয়ার ২০২০ সালের ২৯ শে নভেম্বর তারিখে জার্মানীর আতফালুল আহমদীয়ার সঙ্গে ভার্চুয়াল সাক্ষাতে একজন তিফল প্রশ্ন করে যে, কোরোনা ভাইরাসের জন্য যে টীকা এসেছে, সেগুলি আমাদের নেওয়া উচিত কি না?

হুযুর আনোয়ার বলেন, যদি প্রমাণিত হয় যে, এটি কার্যকরী চিকিৎসা পদ্ধতি আর সরকার টীকা নিতে নির্দেশ দেয়, তবে টীকা নিন, কোনও অসুবিধা নেই। কিন্তু লোকেরা প্রথমে টীকা নিয়ে দেখুক, তাদের কি অভিজ্ঞতা কি, যারা নিয়েছে তাদের হচ্ছে কি না? কেবল ছুঁচ ফোটানোর জন্য টীকা নিবেন না। যদি উপকার হয় তবে অবশ্যই নিন, কোন অসুবিধে নেই।

প্রশ্ন: সেই সাক্ষাত অনুষ্ঠানেই আরও এক তিফল প্রশ্ন করে যে, হুযুর এত কাজ একসঙ্গে কিভাবে করেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রথমত সময় পেলে নিজের প্রতিদিনের কাজ প্রতিদিন শেষ করার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। দ্বিতীয়ত অনেক সময় একসঙ্গে দুটি কাজও হয়ে যায়। কারো কথা শুনছি আর সঙ্গে যদি চিঠিও পড়ে নিই, তাহলে একসঙ্গে দুটি কাজ করতে পারি। এভাবে কম সময়ে বেশি কাজ করা যায়। তাছাড়া কাজ শেষ করতেই হবে এমন সংকল্পও থাকা চাই। কাজ শেষ করার সংকল্প থাকলে মানুষ মনোযোগ দিয়ে কাজ করে আর এর ফলে কাজ পুরো হয়ে যায়। তোমরা পরিশ্রম করলে তোমাদেরও কাজ পুরো হবে। পরিমশ্রম করার অভ্যাস গড়ে তুললে তোমরাও এমনটি করতে পারবে, এটি কোন সমস্যার কথা না।

প্রশ্ন: সেই সাক্ষাত অনুষ্ঠানেই একজন তিফল প্রশ্ন করে যে, হুযুর আনোয়ার কিভাবে খুতবা জুমাআর প্রস্তুতি নেন। হুযুর আনোয়ার বলেন:

কিছু গবেষণাধর্মী বিষয় হয়, যেমন বর্তমানে আমি সাহাবাদের ইতিহাস বর্ণনা করছি। এক্ষেত্রে আমাদের গবেষক দলটি আমাকে উদ্ধৃতিগুলি বের করে দেয়। কিন্তু এমন কিছু খুতবা আছে যেমন তাহরীকে জাদী, ওয়াকফে জাদীদ বা তরবীয়ত সংক্রান্ত বিষয়ে যে খুতবাগুলি আমি সাধারণত দিয়ে থাকি, তার জন্য আমি নিজেই কুরআনের কোনও না কোনও আয়াত বের করে সেগুলি ব্যাখ্যা ও তফসীর করার জন্য আমি নিজে সমস্ত উদ্ধৃতি তৈরী করি। এগুলির জন্যও যদিকোনও উদধৃতির প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে আমি নিজের গবেষকদরের সহায়তা নিই। অনেক সময় আমি নিজেও সমস্ত উদ্ধৃতি খুঁজে বের করি আবার অনেক সময় রিসার্জ টিমকে বলি, অমুক উদ্ধৃতি বের করে দিতে। এরপর আমি খুতবা জুমআম প্রস্তুত করি।

প্রশ্ন: সেই সাক্ষাত অনুষ্ঠানেই এক তিফল প্রশ্ন করে যে, আল্লাহ্ তা'লা কি আগে থেকেই জানেন যে আমরা জান্নাতে যাব না কি দোযখে? যদি তিনি তা জানেন, তবে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি?

হুযুর আনোয়ার এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'এক আল্লাহ্ তা'লার জ্ঞান এবং দ্বিতীয় হল আমাদের কর্ম। আল্লাহ্ তা'লা জানেন যে, অমুক ব্যক্তি দোযখে যাবে কিন্তু তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে রাস্তা দেখিয়েছেন যে অমুক অমুক পুণ্যকর্ম করলে জান্নাতে যাবে আর অমুক অমুক অসৎ কাজ করলে দোযখে যাবে। এই কারণে আল্লাহ্ তা'লার কাছে শুভ পরিণতির জন্য এই দোয়া করা উচিত যে, আমাদের যখন মৃত্যুর সময় আসবে, সেই সময় আমরা যেন আল্লাহ্র কথা মান্যকারী হই যাতে জান্নাতে যাই। বা আমাদের এমন প্রচেষ্টা থাকে। কুরআন শরীফও আমাদের এই দোয়া শিখিয়েছে যে, আমাদের মৃত্যু যেন সেই সময় হয় যখন আল্লাহ্ তা'লা আমাদের উপর সন্তুষ্ট থাকেন। তাই উদ্দেশ্য এটাই যে, আমরা তখন জান্নাতে যাব এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হই। বাকিটুকু আল্লাহ্ তা'লার দয়া, তিনি যাকে খুশি ক্ষমা করতে পারেন। এক ব্যক্তি সম্পর্কে রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে যে, সেই ব্যক্তি ঘোর পাপিষ্ঠ ছিল, অসংখ্য মানুষকে সে হত্যা করেছিল। নিরানব্বই জনকে হত্যা করেছিল। তার মনে এমন ধারণার উদ্রেক হল যে, আমি তো ভীষণ খারাপ মানুষ, তাই আমার নিজের সংশোধন করা উচিত যাতে আল্লাহ্ তা'লা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হন আর আমি জান্নাতে চলে যাই। সে এক মৌলবীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল যে, আমি এতগুলো মানুষকে হত্যা করেছি, ভয়ানক রকমের পাপী। আমি কি জান্নাতে যেতে পারি? মৌলবী তাকে সটান বলে দিল, তোমার জান্নাতে যাওয়া হচ্ছে না। একথা শুনে সে মৌলবীকেও হত্যা করে ফেলল। আর বলল, নিরানব্বই জনকে মেরেছি, আর একজন মেরে একশ পুর্ণ করি। তাকে হত্যা করে সে অন্য এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করল যে, এমন কি কোন উপায় আছে যার দ্বারা আমি আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট করতে পারি? সেই ব্যক্তি বলল, অমুক শহরে এক ব্যক্তি আছে যে তোমাকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে। তার কাছে চলে যাও। সে সেই নির্দেশিত ব্যক্তি উদ্দেশ্যে যাত্রা করল, কিন্তু পথিমধ্যেই তার মৃত্যু হল। যখন তার মৃত্যু হল, তখন আল্লাহ্ তা'লা সেই শহরটিকে তার থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন যে শহর থেকে সে হত্যা করে বের হয়েছিল এবং যে শহরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল সেটিকে নিকটবর্তী করে দিলেন। আল্লাহ্ তা'লা এক রূপক ভাষা ব্যবহার করে ফিরিশতাদেরকে বললেন, সেখানে গিয়ে বল, তার সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত হবে। দুইজন ফিরিশতা এল, একজন তাকে দোযখে নিয়ে যেতে এসেছিল আর জন জান্নাতে। এখন উভয়ের মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয়। যে ফিরিশতা তাকে দোযখে নিয়ে যেতে এসেছিল সে বলছিল, এই ব্যক্তি একশটি হত্যা করেছে। আমি আল্লাহকে বলব একে দোযখে দিতে। আর যে ফিরিশতা

এরপর ৯ পাতায়.....

জুমআর খুতবা

কখনো এমনও হয়েছে যে, পথ চলতে চলতে অন্য বেশ কয়েকটি কাফেলার লোকেরা, যারা হযরত আবু বকর (রা.)-কে তাঁর অধিকাংশ বানিজ্যিক সফরের কারণে সেসব স্থানেই দেখেছিল, জিজ্ঞেস করতো যে, আপনার সাথে ইনি কে? উত্তরে তিনি (রা.) বলতেন, ইনি আমার পথপ্রদর্শক। هٰذَا الرَّجُلُ يَهْدِيْنِي السَّبِيْلَ অর্থাৎ, এই ব্যক্তি আমাকে পথের দিশা দিয়ে থাকেন।

তিনি (সা.) তাকে বলেন, হে সুরাকা! তখন তোমার অবস্থা কীরূপ হবে যখন তোমার হাতে কিসরা বা পারস্য সম্রাটের কঙ্কন থাকবে? সুরাকা বিস্ফারিত দৃষ্টি নিয়ে জিজ্ঞেস করে, কিসরা বিন হুরমুয অর্থাৎ ইরানের বাদশাহ্? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। সুরাকা বিস্ময়াভিভূত হয়ে যায়। কোথায় আরবের মরুর এক বেদুঈন আর কোথায় পারস্য সম্রাটের কঙ্কন? কিন্তু খোদার অপার লীলা দেখুন! হযরত উমর (রা.)-এর যুগে যখন ইরান বিজিত হয় আর গণিমতের মাল (যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ) হিসেবে পারস্য সম্রাটের ধনভাণ্ডার মুসলমানদের হস্তগত হয় তখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদের সাথে কিসরার কঙ্কনও মদিনায় আসে। হযরত উমর (রা.) সুরাকাকে ডাকেন যিনি মক্কা বিজয়ের পর মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন, আর নিজের সামনে তার হাতে কিসরার কঙ্কন পরিয়ে দেন, যা অত্যন্ত মূল্যবান মণিমুক্তা খচিত ছিল। "

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান সাহাবী দ্বিতীয় খলীফায়ে রাশেদ সিদ্দীকে আকবার হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

আট দিন সফরের পর ঐশী সাহায্যে অবশেষে সোমবার তিনি (সা.) মদিনার পথে কুবায় গিয়ে পৌঁছেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (সা.) সোমবার জন্মগ্রহণ করেন, সোমবার মক্কা থেকে যাত্রা আরম্ভ করেন, সোমবার মদিনায় পৌঁছেন এবং সোমবারেই তাঁর (সা.) মৃত্যু হয়।

সকাল হলে বুরায়দা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! মদীনায় প্রবেশের সময় আপনার সাথে একটি পতাকা থাকা উচিত। এরপর তিনি তাঁর পাগড়ি মাথা থেকে খুলে সেটিকে নিজ বর্শায় বেঁধে দেন এবং মহানবী (সা.)-এর সামনে হাঁটতে থাকেন যতক্ষণ না মুসলমানরা মদীনায় প্রবেশ করেছে।

দোয়া করুন, আল্লাহ তা'লা যেন অন্যান্য আসীরান তথা বন্দীদেরও মুক্তির সুযোগ সৃষ্টি করেন।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১৪ই জানুয়ারী, ২০২২, এর জুমুআর খুতবা (৭ সুলাহ, ১৪০১ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্‌হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর স্মৃতিচারণ হচ্ছিল গত সপ্তাহের পূর্বের খুতবায়। সেখানে সুরাকার উল্লেখ করা হয়েছিল যে, সে-ও পুরস্কারের লালসায় মহানবী (সা.)-কে পাকড়াও করার সংকল্প নিয়ে বের হয়েছিল। কিন্তু যখন আল্লাহ্ তা'লার নিয়তি তার সামনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তখন সে মহানবী (সা.)-এর কাছে আবেদন করে যে, রাজত্ব যখন আপনার হবে তখন যেন আমাকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয় আর (এ মর্মে সে) একটি নিরাপত্তাপত্রও লিখিয়ে নেয়। এ সম্পর্কিত কতিপয় রেওয়ায়েত রয়েছে। একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী তার ফিরে আসার সময় মহানবী (সা.) তাকে সম্বোধন করে বলেন, হে সুরাকা! তোমার অবস্থা কেমন হবে যখন পারস্য সম্রাটের কঙ্কন তোমার হাতে থাকবে। সুরাকা আশ্চর্য হয়ে পিছনে ফিরে তাকায় এবং বলে কিসরা বিন হুরমুয?

তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, সেই কিসরা বিন হুরমুয। অতএব যখন হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে কিসরার কঙ্কন এবং তার মুকুট ও কোমরবন্ধনী আনা হয় তখন হযরত উমর (রা.) সুরাকাকে ডাকেন এবং বলেন, তোমার হাত এগিয়ে দাও। তিনি তাকে কঙ্কন পরিয়ে দেন এবং বলেন, বল সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লার যিনি কিসরা বিন হুরমুয থেকে এই উভয়টি ছিনিয়ে (আমাদের) দান করেছেন।

(মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ ওয়াল্লাযীনা মাআহু, লি আব্দিল হামিদ, জাওদাতুস সাহার, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬৫)

এটিও উল্লেখ পাওয়া যায় যে, হিজরতের সফরের সময় নয়, বরং যখন আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) হুনায়েন এবং তায়েফ থেকে ফিরে আসছিলেন, তখন সুরাকা বিন মালেক 'জিরানা' নামক স্থানে ইসলাম গ্রহণ করে। আর 'জিরানা' মক্কা ও তায়েফের পথে মক্কার নিকটবর্তী একটি কূপের নাম। তিনি (সা.) সুরাকাকে বলেন, তোমার তখন কী অবস্থা হবে যখন তুমি কিসরার কঙ্কন পরিধান করবে। (বুখারী বি শারহ আল কিরমানি, খণ্ড-১৪, পৃ: ১৭৮)

এ সম্পর্কে 'সীরাত খাতামান্নাবীঈন' পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এভাবে লিখেছেন যে, সামান্য দূরে যেতেই হযরত আবু বকর (রা.) দেখেন যে, এক ব্যক্তি ঘোড়া হাঁকিয়ে তাঁদের পিছু ধাওয়া করছে। এতে হযরত আবু বকর (রা.) ঘাবড়ে গিয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! কেউ একজন আমাদের পিছু ধাওয়া করছে। তিনি (সা.) বলেন, কোন চিন্তা করো না, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সাথে আছেন। উক্ত পশ্চাদ্ধাবনকারী ছিল সুরাকা বিন মালেক, যে নিজের পশ্চাদ্ধাবনের ঘটনা নিজের ভাষায় স্বয়ং এভাবে বর্ণনা করে যে, মহানবী (সা.) যখন মক্কা থেকে বেরিয়ে যান তখন কুরাইশ কাফেররা এই ঘোষণা করে যে, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা.) অথবা আবু বকরকে জীবিত বা মৃত ধরে আনবে তাকে এত পরিমাণ পুরস্কার দেওয়া হবে। আর এই ঘোষণার কথা তারা নিজেদের বার্তাবাহকদের মাধ্যমে আমাদেরকে অবগত করে। সুরাকা বলে, এরপর একদিন আমি আমার গোত্র বনু মুদলেজ-এর একটি সভায় বসা ছিলাম এমন সময় কুরাইশদের সেসব (বার্তাবাহক) ব্যক্তির মধ্য থেকে এক ব্যক্তি আমাদের কাছে আসে। আর আমাকে সম্বোধন করে বলে, আমি এখনই সমুদ্র তীরের দিকে দূর থেকে কতিপয় চেহারা দেখেছি। আমার মনে হয় তারা হয়ত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাথী হবে। সুরাকা বলে, আমি তাৎক্ষণিকভাবে বুঝতে পারি যে, অবশ্যই তাঁরাই হবে। "

এরপর হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব সেই বর্ণনাই তুলে ধরেছেন যা সুরাকার পশ্চাদ্ধাবনের সময় ভাগ্যসূচক লটারি তার বিরুদ্ধে যাওয়া আর তার ঘোড়া (বালুতে) আটকে যাওয়া সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। যাহোক, সুরাকা বলে, আমার সাথে সংঘটিত ঘটনার কারণে আমি মনে করেছিলাম যে, এই ব্যক্তির ভাগ্য-নক্ষত্র এখন তুঙ্গে রয়েছে আর অবশেষে তিনিই (সা.) বিজয়ী হবেন। কাজেই, সন্ধি প্রস্তাব হিসেবে আমি তাঁকে বলি, আপনার জাতি আপনাকে হত্যা করার কিংবা ধরে আনার বিনিময়ে এই পরিমাণ পুরস্কার নির্ধারণ করেছে আর মানুষ আপনার সম্পর্কে এই এই পরিকল্পনা করছে আর আমিও এই উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছিলাম, কিন্তু এখন আমি ফিরে যাচ্ছি। " এরপর সুরাকার অবশিষ্ট ঘটনা বর্ণিত হয়, অতঃপর সুরাকার কঙ্কন পরিধান সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এভাবে লিখেন যে, "সুরাকা যখন ফিরে যেতে উদ্যত হয় তখন তিনি (সা.) তাকে বলেন, হে সুরাকা! তখন তোমার অবস্থা কীরূপ হবে যখন তোমার হাতে কিসরা বা পারস্য সম্রাটের কঙ্কন থাকবে?

সুরাকা বিস্ফারিত দৃষ্টি নিয়ে জিজ্ঞেস করে, কিসরা বিন হুরমুয অর্থাৎ ইরানের বাদশাহ্? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। সুরাকা বিস্ময়াভিভূত হয়ে যায়। কোথায় আরবের মরুর এক বেদুঈন আর কোথায় পারস্য সম্রাটের কঙ্কন? কিন্তু খোদার অপার লীলা দেখুন! হযরত উমর (রা.)-এর যুগে যখন ইরান বিজিত হয় আর গণিমতের মাল (যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ) হিসেবে পারস্য সম্রাটের ধনভাণ্ডার মুসলমানদের হস্তগত হয় তখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদের সাথে কিসরার কঙ্কনও মদিনায় আসে। হযরত উমর (রা.) সুরাকাকে ডাকেন যিনি মক্কা বিজয়ের পর মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন, আর নিজের সামনে তার হাতে কিসরার কঙ্কন পরিয়ে দেন, যা অত্যন্ত মূল্যবান মণিমুক্তা খচিত ছিল। "

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ, পৃ: ২১৬-২১৭)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই ঘটনার উল্লেখ করে এভাবে বলেন যে, "তারা অর্থাৎ, মক্কার লোকেরা ঘোষণা করে যে, যে-ই মুহাম্মদ (সা.) অথবা আবু বকর (রা.)-কে জীবিত অথবা মৃত ফিরিয়ে নিয়ে আসবে তাকে পুরস্কার স্বরূপ একশ' উটনী প্রদান করা হবে। আর এই (পুরস্কার) ঘোষণার সংবাদ মক্কার চতুষ্পার্শ্বের গোত্রগুলোকে প্রেরণ করা হয়। অতএব, তখন একজন বেদুঈন নেতা সুরাকা বিন মালেকও উক্ত পুরস্কারের লোভে তাঁর পিছু ধাওয়া করে। খুঁজতে খুঁজতে সে মদিনার পথে গিয়ে তাঁর দেখা পায়। সে যখন দুটি উটনী এবং তাদের আরোহীদের দেখে আর বুঝতে পারে যে, (তাঁরা) মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং তাঁর সঙ্গী, তখন সে নিজের ঘোড়া তাঁদের পেছনে ছোটাতে থাকে।"

এরপর তিনি (রা.) পুরো ঘটনা বিবৃত করেন অর্থাৎ, সুরাকার ঘোড়া হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়া এবং লটারী করার (বা শুভ-অশুভ নির্ণয় করার) ঘটনা। এরপর তিনি বলেন, সুরাকা বলে, মহানবী (সা.) পরম গাম্ভীর্যের সাথে নিজের উটনীতে চড়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি পেছন ফিরে আমাকে দেখেনও নি, কিন্তু আবু কবর (রা.) মহানবী (সা.)-এর কোন ক্ষতি না হয়- এই ভয়ে বার বার মুখ ঘুরিয়ে আমাকে দেখছিলেন। "

এই পশ্চাদ্ধাবনের ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা করার পর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন যে, সুরাকা যখন ফিরে যেতে উদ্যত হয় তখন তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্ তা'লা অদৃশ্য হতে সুরাকার ভবিষ্যতের অবস্থা তাঁর (সা.) কাছে প্রকাশ করেন আর সে অনুসারে তিনি (সা.) তাকে বলেন, হে সুরাকা! তখন তোমার কী অবস্থা হবে যখন তোমার হাতে পারস্য সম্রাটের কঙ্কন শোভা পাবে। সুরাকা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, কিসরা বিন হুরমুয অর্থাৎ, (আপনি) ইরানের বাদশাহ্র কঙ্কনের (কথা বলছেন)? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী ষোলো-সতেরো বছর পরে গিয়ে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়। সুরাকা মুসলমান হয়ে মদিনায় চলে আসে। মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর প্রথমে হযরত আবু বকর (রা.) এরপর হযরত উমর (রা.) খলীফা হন। ইসলামের ক্রমবর্ধমান মহিমা বা বিস্তৃতি দেখে ইরানীরা মুসলমানদের ওপর উপর্যুপরি আক্রমণ করতে থাকে কিন্তু ইসলামকে পদপিষ্ট করার পরিবর্তে তারা নিজেরাই ইসলামের মোকাবিলায় পরাভূত হয়। পারস্য সম্রাটের রাজধানী ইসলামী সৈন্যবাহিনীর অশ্বের পদাঘাতে পিষ্ট হয় আর ইরানের ধনভাণ্ডার মুসলমানদের করতলগত হয়। ইরানী সাম্রাজ্যের যেসব সম্পদ ইসলামী সেনাদলের হস্তগত হয় তাতে সেই কঙ্কনগুলোও ছিল যা ইরানী রীতি অনুসারে ইরান-সম্রাট সিংহাসনে আরোহনের সময় পরিধান করতো। সুরাকা মুসলমান হওয়ার পর নিজের এই ঘটনাটি, যা মহানবী (সা.)-এর হিজরতকালে তার সাথে সংঘটিত হয়, অত্যন্ত গর্বের সাথে মুসলমানদেরকে শুনাতো আর মুসলমানরা একথা জানতো যে, মহানবী (সা.) তাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন যে, হে সুরাকা! তখন তোমার অবস্থা কী হবে যখন কিসরা'র কঙ্কন তোমার হাতে শোভা পাবে? হযরত উমর (রা.)-এর সামনে যখন গণিমতের মাল (তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) উপস্থিত করা হয় এবং তিনি সেগুলোর মাঝে কিসরা'র কঙ্কন লক্ষ্য করেন, তখন পুরো চিত্র তার চোখের সামনে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, সেই দুর্বলতা ও শক্তিহীনতার সময়, যখন খোদার রসূলকে মাতৃভূমি ত্যাগ করে মদিনায় আসতে হয়েছিল; সেই সুরাকা এবং অন্যদের তাঁর পেছনে এজন্য ঘোড়া নিয়ে ছোটা যে, তাঁকে হত্যা করে বা জীবিতাবস্থায় যে কোন রূপে মক্কাবাসীদের কাছে পৌঁছে দিলে তারা শত উটনীর মালিক হয়ে যাবে আর এমন সময়ে সুরাকাকে মহানবী (সা.)-এর এই কথা বলা যে, হে সুরাকা! তখন তোমার অবস্থা কী হবে যখন কিসরা'র কঙ্কন তোমার হাতে থাকবে- (এটি) কত বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী ছিল! কী নির্মল গায়েব তথা অদৃশ্যের সংবাদ ছিল! হযরত উমর (রা.) নিজের সামনে কিসরা'র কঙ্কন লক্ষ্য করলে খোদা তা'লার কুদরত বা শক্তি তাঁর দৃষ্টিপটে ভেসে ওঠে। তিনি (রা.) বলেন, সুরাকাকে ডাক। সুরাকাকে ডাকা হলে হযরত উমর (রা.) তাকে কিসরা'র কঙ্কন নিজ হাতে পরার আদেশ দেন। সুরাকা বলে, হে আল্লাহ্র রসূলের খলীফা! মুসলমান (পুরুষের) জন্য তো স্বর্ণ পরা নিষিদ্ধ। হযরত উমর (রা.) বলেন, হ্যাঁ, নিষিদ্ধ, কিন্তু এমন উপলক্ষ্যে নয়। আল্লাহ্ তা'লা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে তোমার হাতে সোনার কঙ্কন (পরিহিত) অবস্থা দেখিয়েছিলেন। হয় তুমি এই কঙ্কন পরবে অথবা আমি তোমাকে শাস্তি দিব। সুরাকা'র আপত্তি কেবল শরীয়তের কারণে ছিল, অন্যথায় তিনি নিজেও মহানবী (সা.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে দেখার আকাঙ্ক্ষী ছিল। সুরাকা সেই কঙ্কন নিজের হাতে পরে নেয় এবং মুসলমানরা এই মহান ভবিষ্যদ্বাণী স্বচক্ষে পূর্ণ হতে দেখে। "

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, ২০ খণ্ড, পৃ: ২২৪-২২৬)

অতঃপর বর্ণিত হয়েছে যে, ফিরে আসার সময় একটি কাফেলা, যেটিকে কুরাইশরা-ই তাঁর (সা.) সন্ধানে প্রেরণ করেছিল, সুরাকাকে তাঁর (সা.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। কিন্তু সুরাকা শুধু এটিই নয় যে, মহানবী (সা.) সম্পর্কে (তাদেরকে) কিছুই বলে নি, বরং এমনভাবে কথা বলে যার ফলে পশ্চাদ্ধাবনকারীরা ফিরে যায়।

(সুবালুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৪৯)

হিজরতের এই ভ্রমণে উম্মে মা'বাদের একটি ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। হিজরতের এই সফরে একটি তাঁবুর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় পাথেয়-এর সন্ধানে মহানবী (সা.)-এর এই কাফেলা যাত্রাবিরতি দেয়। এটি ছিল উম্মে মা'বাদের তাঁবু; তার পূর্ণ নাম ছিল আতেকা বিনতে খালেদ। তিনি খুযাআ গোত্রের বনু কা'ব শাখার সদস্যা ছিলেন। তিনি হযরত হুবায়েশ বিন খালেদ এর বোন ছিলেন; যিনি সাহাবী হওয়ার এবং হাদীস বর্ণনা করার সম্মান লাভ করেছিলেন। উম্মে মা'বাদের স্বামীর নাম ছিল আবু মা'বাদ (রা.)। বলা হয়ে থাকে যে, তিনিও মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশাতেই মৃত্যু বরণ করেন। আবু মা'বাদের প্রকৃত নাম জানা নেই। উম্মে মা'বাদের তাঁবু কুদায়েদ নামক স্থানে ছিল। কুদায়েদ মক্কার অদূরে অবস্থি ত একটি উপশহরের নাম, যা রাবেক থেকে কয়েক মাইল দূরে দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। এখানেই প্রসিদ্ধ 'মানাত' প্রতিমা স্থাপন করা হয়েছিল। মদীনাবাসীরা এর উপাসনা করত।

(আর রওজুল উনাফ, ২ য় খণ্ড, পৃ: ৩২৫)

উম্মে মা'বাদ ছিলেন একজন সাহসী এবং দৃঢ়চেতা/শক্তিশালী নারী। তিনি তার তাঁবুর প্রাঙ্গনে বসে থাকতেন আর সেই পথের পথিকদের আতিথেয়তা করতেন। তিনি (সা.) ও তাঁর সঙ্গী-সাথীরা তার কাছে মাংস ও খেজুর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন যেন তাঁর কাছ থেকে তা কিনে নিতে পারেন, কিন্তু তাঁর কাছে এগুলোর কিছুই ছিল না। তখন উম্মে মা'বাদের গোত্র অভাবগ্রস্ত ও দুর্ভিক্ষ কবলিত ছিল। উম্মে মা'বাদ বলেন, আমাদের কাছে যদি কিছু থাকত তাহলে আমরা তোমাদের কাছ থেকে তা দূরে রাখতাম না। মহানবী (সা.) তাঁবুর এক কোণায় একটি বকরী দেখতে পান। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, হে উম্মে মা'বাদ! এই বকরীটির কী হয়েছে? তিনি নিবেদন করেন যে, এটি এমন এক বকরী যাকে দুর্বলতা নিজ পাল থেকে দূরে রেখেছে। অর্থাৎ এর মাঝে পালের সাথে বাইরে চরতে যাওয়ার শক্তিও নেই। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, এর (ওলানে) কি দুধ আছে? তিনি বলেন, এটি তার চেয়ে অনেক বেশি দু র্বল, এর পক্ষে দুধ দেয়া সম্ভব নয়। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি আমাকে এর দুধ দোহন করার অনুমতি দিবে? তিনি (রা.) বলেন, আপনি যদি এর (ওলানে) দুধ দেখতে পান তাহলে নিঃসঙ্কোচে দুধ দোহন করে নিতে পারেন, আমার কোন আপত্তি নেই। তখন মহানবী (সা.) সেই বকরীটি আনিয়ে সেটির ওলানে হাত বুলান আর মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করেন এবং উম্মে মা'বাদের জন্য তার বকরীর মাঝে কল্যাণের দোয়া করেন। বকরীটি তাঁর (সা.) সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে যায় এবং সেটি অনেক দুধ দেয় আর জাবরকাটা আরম্ভ করে। এরপর তিনি (সা.) তার কাছ থেকে এমন একটি পাত্র চান যেটি এক দল লোককে তৃপ্ত করতে পারত। সেটিতে তিনি এতটা দুধ দোহন করেন যে, ফেনা পাত্রের ওপর পর্যন্ত উঠে আসে। এরপর তিনি উম্মে মা'বাদকে পান করান, এমনকি তিনি (রা.) পরিতৃপ্ত হয়ে যান। অতঃপর তিনি (সা.) নিজ সাথীদের পান করান, এমনকি তারাও পরিতৃপ্ত হয়ে যায়। তাদের সবার শেষে তিনি (সা.) নিজে পান করেন এবং বলেন, জাতিকে যে পান করায় সে সবার শেষে পান করে। এরপর কিছুটা বিরতি দিয়ে তিনি (সা.) সেই পাত্রে পুনরায় দুধ দোহন করেন, এমনকি সেটি পূর্ণ হয়ে যায়। তিনি সেটিকে উম্মে মা'বাদের কাছে রেখে দেন। এরপর তিনি (সা.) সেই বকরীটি ক্রয় করে সফরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন।

(সুবালুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৪৪-২৪৫)

বর্ণিত হয়েছে যে, এক দিকে মহানবী (সা.) এবং তাঁর (সা.) নিবেদিত প্রাণ সফরসঙ্গী হযরত আবু বকর (রা.) ঐশী সাহায্য ও সমর্থনে সুরক্ষাকারী ফিরিশতাদের সাহচর্যে সফররত ছিলেন আর অন্য দিকে মক্কাবাসীরা তখনও পরাজয় বরণ করে নি।

তারাও অনবরত তাঁর (সা.) পশ্চাদ্ধাবনে রত ছিল। অতএব কুরাইশদের পক্ষ থেকে প্রেরিত পশ্চাদ্ধাবনকারী একটি দল মহানবী (সা.)-এর সন্ধান করতে করতে উম্মে মা'বাদের তাঁবুতে এসে উপস্থিত হয় আর তারা নিজেদের বাহন থেকে অবতরণ করতেই মহানবী (সা.)-এর বিষয়ে জিজ্ঞেস করা আরম্ভ করে।

উম্মে মা'বাদ ঘটনা কিছুটা আঁচ করতে পারেন এবং বলেন, তোমরা এমন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছ যা আমি পূর্বে কখনো শুনি নি, আর তোমরা কী চাচ্ছ তা ও আমি বুঝতে পারছি না। তারা যখন কিছুটা কঠোর ভাষায় তাদের প্রশ্ন করা আরম্ভ করে, তখন অভিজ্ঞ ও সাহসী এই নারী বলেন, তোমরা যদি এখনই আমার কাছ থেকে দূর না হও তাহলে আমি চিৎকার করে আমার গোত্রের লোকদের ডাকব। তারা এই ভদ্র মহিলার মানমর্যাদার বিষয়ে অবগত ছিল তাই সেখান থেকে ফিরে যাওয়ার মাঝেই মঙ্গল মনে করে।

(মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ ওয়াল্লাযীনা মাআহু, লি আব্দিল হামিদ, জাওদাতুস সাহার, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬৭)

পথিমধ্যে মহানবী (সা.)-এর সাথে হযরত যুবায়ের (রা.)-এর সাক্ষাৎ হয়, তিনি মুসলমানদের একটি কাফেলার সাথে সিরিয়া থেকে বাণিজ্য শেষে ফিরে আসছিলেন। হযরত যুবায়ের (রা.) মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.)-কে শুভ্র পোশাক পরিধান করান।

(সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস-৩৯০৬)

এই সাক্ষাতের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন, "পথিমধ্যে যুবায়ের বিন আল-আওয়াম (রা.)-এর সাথে (কাফেলার) সাক্ষাৎ হয়। তিনি সিরিয়া থেকে বাণিজ্য শেষে মুসলমানদের ক্ষুদ্র একটি দলের সাথে মক্কায় ফিরছিলেন। যুবায়ের (রা.) একজোড়া শুভ্র কাপড় মহানবী (সা.)-কে আর একজোড়া হযরত আবু বকর (রা.)-কে উপঢৌকনস্বরূপ প্রদান করেন এবং বলেন, আমিও মক্কা হয়ে অতি শীঘ্র মদিনায় এসে আপনাদের সাথে মিলিত হব।" (সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ, পৃ: ২৪২)

অতঃপর বুখারীর একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, (হিজরতের সেই সফরে) কখনো এমনও হয়েছে যে, পথ চলতে চলতে অন্য বেশ কয়েকটি কাফেলার লোকেরা, যারা হযরত আবু বকর (রা.)-কে তাঁর অধিকাংশ বানিজ্যিক সফরের কারণে সেসব স্থানেই দেখেছিল, জিজ্ঞেস করতো যে, আপনার সাথে ইনি কে? উত্তরে তিনি (রা.) বলতেন, ইনি আমার পথপ্রদর্শক। هٰذَا الرَّجُلُ يَهْدِيْنِي السَّبِيْلَ অর্থাৎ, এই ব্যক্তি আমাকে পথের দিশা দিয়ে থাকেন। মানুষ ভাবতো তিনি (পথ দেখানো) গাইড আর হযরত আবু বকর (রা.)-এর কথার অর্থ ছিল হেদায়াতের পথ।

(সহীহ আল বুখারী, কিতাবু মানাকিবুল আনসার, হাদীস-৩৯১১)

এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এভাবে লিখেন যে, "হযরত আবু বকর (রা.) ব্যবসায়ী হওয়ার কারণে এই রাস্তা দিয়ে বারবার আসা-যাওয়া করতেন। এ কারণে অধিকাংশ মানুষ তাঁকে চিনতো, কিন্তু মহানবী (সা.)-কে তারা চিনতো না। তাই তারা হযরত আবু বকর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করতো যে, তোমার সামনে কে এগিয়ে যাচ্ছে? হযরত আবু বকর (রা.) বলতেন, هٰذَا الرَّجُلُ يَهْدِيْنِي السَّبِيْلَ অর্থাৎ, ইনি আমার পথপ্রদর্শক। তারা মনে করতো, সম্ভবত ইনি কোন গাইড হবেন যাকে হযরত আবু বকর (রা.) পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাথে নিয়েছেন, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.)-এর কথার অর্থ হতো ভিন্ন।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ, পৃ: ২৪২)

চূড়ান্ত গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে যে, আট দিন সফরের পর ঐশী সাহায্যে অবশেষে সোমবার তিনি (সা.) মদিনার পথে কুবায় গিয়ে পৌঁছেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (সা.) সোমবার জন্মগ্রহণ করেন, সোমবার মক্কা থেকে যাত্রা আরম্ভ করেন, সোমবার মদিনায় পৌঁছেন এবং সোমবারেই তাঁর (সা.) মৃত্যু হয়।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫৩) ((সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ, পৃ: ২৪৩)

কুবা একটি কুয়ার নাম ছিল, যার কারণে গোটা বসতি কুবা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এখানে আনসারদের বনু আমর বিন অওফ গোত্রের লোকদের বসবাস ছিল। এই বসতি মদিনা থেকে দুই মাইল দূরত্বে অবস্থিত।

(মুজামুল বালদান, লি শিহাবুদ্দীন ইয়াকুত আল হামুবি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৭৭)

কারো করো মতে মদিনা থেকে কুবার দূরত্ব ছিল তিন মাইল। একে আলিয়া-ও বলা হয়ে থাকে। (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ২৩০)

মদিনার মুসলমানরা মহানবী (সা.)-এর মক্কা থেকে যাত্রার সংবাদ পেয়ে গিয়েছিল। তারা প্রতিদিন সকালে হাররা পর্যন্ত যেতো এবং তাঁর (সা.) জন্য অপেক্ষা করতো। মদিনা দুটি হাররাএর মধ্যবতী স্থানে অবস্থিত। 'হাররা' বলা হয় কালো কঙ্করময় ভূমিকে। মদিনার পূর্বদিকে 'হাররাতুল ওয়াকিম' অবস্থিত যেটিকে হাররা বনু কুরায়যা-ও বলা হয়ে থাকে এবং দ্বিতীয়টি হল 'হাররাতুল ওয়াবরা' যা মদিনার পশ্চিমে তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত। এরপর দুপুরের খরতাপ তাদেরকে ফিরিয়ে আনতো। অর্থাৎ, তারা সকালে যেতো, অপেক্ষা করতো এবং দুপুরে ফিরে আসতো। একদিন বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর মদিনাবাসী ফিরে আসে। তারা যখন নিজেদের ঘরে পৌঁছে তখন এক ইহুদি ব্যক্তি নিজের দুর্গসমূহের একটিতে কোন কাজের জন্য আরোহন করে, যেন সেটির দেখাশোনা করতে পারে। তখন সে মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাথিদের দেখতে পায়, যারা শুভ্র পোশাক পরিহিত ছিলেন। তাদের ওপর থেকে মরীচিকা দূর হচ্ছিল। সেই ইহুদি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে নি এবং সে উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলে, হে আরবের অধিবাসীরা! তোমাদের সেই মনিব আসছেন যার জন্য তোমরা অপেক্ষা করে আছ। মুসলমানরা তখন দ্রুত অস্ত্র হাতে নেয় এবং হাররা নামক স্থানে মহানবী (সা.)-এর সাথে মিলিত হয়। তিনি (সা.) তাদেরকে নিয়ে ডানদিকে ঘুরেন এবং বনু আমর বিন অওফ-এর পাড়ায় গিয়ে তাদের সাথে সেখানে অবতরণ করেন। সেদিন ছিল সোমবার এবং রবিউল আউয়াল মাস। হযরত আবু বকর (রা.) মানুষের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হন এবং মহানবী (সা.) নিশ্চুপ বসেছিলেন। আর আনসারদের মধ্য থেকে যারা মহানবী (সা.)-কে (পূর্বে) দেখে নি, তারা আসে এবং হযরত আবু বকর (রা.)-কে সালাম দিতে থাকে। ইত্যবসরে মহানবী (সা.)-এর ওপর রোদ এসে পড়ছিল। হযরত আবু বকর (রা.) সামনে এগিয়ে আসেন এবং তিনি নিজের চাদর দিয়ে মহানবী (সা.)-এর ওপর ছায়া প্রদান করেন। তখন মানুষ মহানবী (সা.)-কে চিনতে পারে। মহানবী (সা.) বনু আমর বিন অওফ-এর মহল্লায় দশ রাতের অধিক, কিংবা বুখারীর অন্য একটি বর্ণনা অনুযায়ী চৌদ্দ রাত অবস্থান করেন আর সেই মসজিদের ভিত্তি রাখেন যা তাকওয়ার ভিত্তিতে নির্মাণ করা হয়েছিল এবং তাতে তিনি (সা.) নামায আদায় করেন।

(সহীহ আল বুখারী, কিতাবু মানাকিবুল আনসার, হাদীস-৩৯০৬)(সহীহ আল বুখারী, কিতাবুস সালাত, হাদীস-৪২৮)(ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ১০১-১০২

বুখারীর এ রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহানবী (সা.) ১০-এর অধিক রাত কুবায় অবস্থান করেন।

একটি বর্ননানুযায়ী মহানবী (সা.) বনু উমর বিন অউফ, অর্থাৎ কুবাতে সোম, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার চার দিন অবস্থান করেন এবং জুমুআর দিন মদিনার দিকে যান। আরেকটি বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি (সা.) ২২ রাত অবস্থান করেন। (আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৭৫)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) মহানবী (সা.)-এর কুবায় আগমনের উল্লেখ করে বলেন, সুরাকাকে বিদায় জানানোর পর কয়েক মনযিল অতিক্রম করে রসূলুল্লাহ্ (সা.) মদিনায় পৌঁছে যান। মদিনার লোকেরা ব্যাকুল হয়ে মহানবী (সা.)-এর জন্য অপেক্ষা করছিল আর তাদের জন্য এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কী হতে পারে যে, যেই সূর্য মক্কার (অধিবাসীদের) জন্য উদিত হয়েছিল, তা মদিনার লোকদের জন্য উদিত হচ্ছে। যখন তারা, অর্থাৎ মদিনাবাসীরা এ সংবাদ পায় যে, মহানবী (সা.) মক্কায় নেই, সেদিন থেকেই তারা তাঁর (সা.) জন্য অপেক্ষা করছিল। তাদের প্রতিনিধি প্রতিদিন মদিনার বাইরে কয়েক মাইল দূর পর্যন্ত তাঁর (সা.) সন্ধানে বের হতো এবং সন্ধ্যায় নিরাশ হয়ে ফিরে আসত। তিনি (সা.) যখন মদিনার কাছাকাছি পৌঁছেন তখন তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, প্রথমে তিনি কুবাতে অবস্থান করবেন, যা মদিনার পার্শ্ববর্তী একটি গ্রাম। একজন ইহুদি তাঁর (সা.) উটনীগুলোকে আসতে দেখে বুঝতে পারে যে, এটি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাফেলা। তখন সে একটি টিলার উপর চড়ে এবং চিৎকার করে বলে, হে ক্যায়লার সন্তানগণ! (ক্যায়লা মদিনাবাসীদের এক দাদী ছিল) তাই সেখানকার লোকদের ক্যায়লার সন্তান বলেও ডাকা হতো, তোমরা যার প্রতীক্ষা করছ তিনি এসে গেছেন। এ ধ্বনি পৌঁছামাত্রই মদিনার সব মানুষ কুবার দিকে ছুটে। কুবার অধিবাসীরা এটি ভেবে যে, খোদার নবী তাদের কাছে অবস্থান করতে এসেছেন, আনন্দে উল্লসিত হয়। তখন এরূপ একটি ঘটনা ঘটে যা মহানবী (সা.) এর পরম দ্বীনতার প্রমাণ বহন করে। মদিনার অধিকাংশ লোক তাঁর (সা.) চেহারা চিনত না। কুবার বাইরে যখন তিনি (সা.) একটি বৃক্ষের নীচে বসেছিলেন এবং মানুষ দৌঁড়ে মদিনা থেকে তাঁর কাছে ছুটে আসছিল, তখন যেহেতু রসূলুল্লাহ্ (সা.) খুব সাদাসিধাভাবে বসেছিলেন, তাই তাদের মধ্যে যারা তাঁকে চিনত না তারা হযরত আবু বকরকে দেখে, যিনি বয়সে ছোট হলেও তার দাড়িতে কিছুটা পাক ধরেছিল, অনুরূপভাবে তার পোশাকও রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চেয়ে কিছুটা ভালো ছিল, এটিই ভেবে নেয় যে, আবু বকরই হলেন রসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং খুব আদবের সাথে তার দিকে মুখ করে বসছিল। হযরত আবু বকর এটি দেখে বুঝতে পারেন যে, মানুষ ভুল ভাবছে। তিনি দ্রুত সূর্যের সামনে চাদর মেলে ধরে দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার ওপর রোদ পড়ছে, আমি আপনার ওপর ছায়া দিচ্ছি। এই সূক্ষ্ম কৌশলে তিনি মানুষকে তাদের ভুল ধরিয়ে দেন। "

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ২২৬-২২৭)

এ ঘটনাটি বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব বুখারীর একটি উদ্ধৃতি বর্ণনা করেছেন। সেটির উল্লেখ করে তিনি বলেন, বুখারীতে বারা বিন আযেব (রা.)-এর বর্ণনা রয়েছে যে, মহানবী (সা.)-এর মদিনা আগমনে আনসারগণ যেরূপ আনন্দিত হন অন্য কোন উপলক্ষ্যে আমি তাদেরকে সেরূপ আনন্দিত হতে দেখি নি।

তিরমিযি ও ইবনে মাজাহ্ আনাস বিন মালেক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা.)-এর আগমনে তারা এরূপ অনুভব করেন যে, আমাদের জন্য মদিনা আলোকিত হয়ে গেছে। আর যেদিন তিনি (সা.) মৃত্যু বরণ করেন, মদিনা শহরকে ঐদিনের চাইতে অধিক অন্ধকার আমরা আর কখনো দেখি নি।

যারা স্বাগত জানাতে এসেছিল, তাদের সাথে সাক্ষাতের পর মহানবী (সা.) কোন ধারণার ভিত্তিতে, যার উল্লেখ ইতিহাসে নেই, সরাসরি শহরে প্রবেশ করেন নি বরং ডান দিকে সরে গিয়ে মদীনার উঁচুঅংশের জনবসতি যা আসল শহর হতে প্রায় দুই বা আড়াই মাইল দূরে অবস্থিত ছিল, যার নাম ছিল কুবা সেখানে যান। এখানে আনসারদের কয়েকটি পরিবারের বসতি ছিল, যাদের মাঝে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আমর বিন অওফ (রা.)-এর পরিবার ছিল। সে যুগে এই বংশের নেতা ছিলেন কুলসুম বিন আল হিদাম। কুবার আনসাররা মহানবী (সা.)কে খুবই উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায় আর তিনি (সা.) কুলসুম বিন আল হিদামের বাড়িতে অবস্থান করেন। মহানবী (সা.)-এর পূর্বে যে সকল মুহাজের মদীনায় পৌঁছে গিয়েছিলেন তাদের অধিকাংশও কুবাতে কুলসুম বিন আল হিদাম এবং অন্যান্য সম্মানিত আনসারদের নিকট অবস্থান করছিলেন। একারণেই হয়তো মহানবী (সা.) প্রথমে কুবাতে অবস্থান করা পছন্দ করেছেন। মুহূর্তের মধ্যেই গোটা মদীনায় মহানবী (সা.)-এর আগমনের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। ফলে সমস্ত মুসলমান আনন্দের আতিশয্যে উদ্বেলিত হয়ে দলে দলে গিয়ে তাঁর অবস্থান স্থলে একত্রিত হতে থাকে।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা- মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ, পৃ: ২৬৪-২৬৫)

কুবার মসজিদ নির্মাণের ব্যাপরে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, কুবাতে অবস্থানকালে রসূল করীম (সা.) একটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন যাকে মসজিদে কুবা বলা হয়। সহীহ্ বুখারীতে রয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বনু আমার বিন অওফের মহল্লায় দশের অধিক রাত্রি অবস্থান করেন এবং সেই মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন যার ভিত্তি তাকওয়ার ওপর রাখা হয়েছে আর তাতে রসূলুল্লাহ্ (সা.) নামায পড়েন।

(বুখারী, কিতাবুল মানাকিবিল আনাসার, হাদীস-৩৯০৬)

রেওয়ায়েত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বনু আমর বিন অওফের জন্য মসজিদের ভিত্তি রাখেন। এর ভিত্তি স্থাপনের সময় মহানবী (সা.) প্রথমে কিবলার দিকে একটি পাথর রাখেন, এরপর হযরত আবু বকর (রা.) একটি পাথর এনে রাখেন, এরপর হযরত উমর (রা.) একটি পাথর নিয়ে এসে হযরত আবু বকর (রা.) -এর পাথরের পাশে রেখে দেন আর এরপর সবাই এর নির্মাণ কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কুবার মসজিদের নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময় নবী করীম (সা.) পাথর আনতেন আর সেটিকে তিনি তাঁর পেটের সাথে লাগিয়ে রাখতেন অর্থাৎ পাথর খুবই ভারি ছিল। সেটিকে (এনে) তিনি নিচে নামিয়ে রাখতেন। এক ব্যক্তি এসে সেই পাথরটি উঠাতে চায় কিন্তু সে সেটি উঠাতে পারে নি। তখন তিনি (সা.) তাকে নির্দেশ দেন এটি ছাড় এবং অন্য কোন পাথর নিয়ে এসো।

(আর রওজুল উনাফ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৩২, তাসিস মসজিদ কুবা)

মসজিদে কুবা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে এটিই সেই মসজিদ যেটির ভিত্তি তাকওয়ার ওপর রাখা হয়েছিল। কিন্তু কোন কোন রেওয়ায়েতে মসজিদে নববীকে সেই মসজিদ আখ্যা দেওয়া হয়েছে যার ভিত্তি তাকওয়ার ওপর রাখা হয়েছিল। সীরাতে হালাবিয়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, এ দুটি বক্তব্যের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, কেননা এ দুটি মসজিদের প্রত্যেকটির ভিত্তি তাকওয়ার ওপর রাখা হয়েছে। এ বক্তব্যের সমর্থনে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েত রয়েছে। এই রেওয়ায়েত অনুসারে তাঁর মতামত ছিল, মদীনার সকল মসজিদ যেগুলোর মধ্যে কুবার মসজিদও অন্তর্ভুক্ত সেগুলোর ভিত্তি তাকওয়ার ওপর রাখা হয়েছিল। কিন্তু যে (মসজিদ) সম্পর্কে আয়াত নাযেল হয়েছিল সেটি আসলে মসজিদে কুবা-ই।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৭৫)

১০ দিন অথবা ১৪ দিন অবস্থানের পর শুক্রবারে মহানবী (সা.) কুবা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, পথিমধ্যে বনু সালেম বিন অওফের জনবসতিতেপৌঁছলে জুমুআর সময় হয়ে যায়। তখন মহানবী (সা.) মুসলমানদের সাথে রানুনা উপত্যকার মসজিদে জুমুআর নামায পড়েন আর তাদের সংখ্যা ছিল ১০০ জন। রানুনা উপত্যকাটি মদীনার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। মহানবী (সা.) এর এখানে জুমুআর নামায পড়ার পর থেকে এই মসজিদকে মসজিদুল জুমুআ বলা শুরু হয়। এটি ছিল মদীনাতে মহানবী (সা.)-এর প্রথম জুমুআর নামায।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৮১) (আসসীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে হিশাম,পৃ: ৩৪৯) (এটলাস সীরাত নববী, পৃ: ১৬৮)

সম্ভবত এখানে নামায পড়ার কারণেই পরে সেখানে এই মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে আর এজন্য

এই নাম রাখা হয়েছে। এছাড়া উল্লেখ পাওয়া যায় যে, জুমুআর নামায পড়ার পর রসূলুল্ল াহ্ (সা.) তাঁর উটনীতে আরোহণ করে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন আর তখন তিনি (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)কে (নিজের বাহনের) পিছনে বসিয়ে রেখেছিলেন।

(শারহা যারকানী আলা মোয়াহিবুল লাদানি, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৫৭)

পুরস্কারের লোভে অনেক লোকই মহানবী (সা.)-এর পশ্চাৎধাবনের চেষ্টা করে। ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে একটি ঘটনাবর্ণিত হয়েছে, তাহলো, বুরায়দা বিন হুসায়েব বর্ণনা করেন কুরাইশরা যখন সেই ব্যক্তির জন্য একশ' উট পুরস্কার ঘোষণা করে যে মহানবী (সা.)-কে জীবিত বা মৃত ধরে আনবে , তখন আমাকেও লোভ পেয়ে বসল। তাই আমি বনু সাহম গোত্রের সত্তরজন লোক সাথে নিয়ে বের হই এবং তাঁর (সা.) কাছে পৌঁছে যাই। তিনি (সা.) আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে? আমি বললাম, বুরায়দা। তখন তিনি (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, হে আবু বকর! আমাদের জন্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও শান্ত হয়ে গিয়েছে। এরপর তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তুমি কোন গোত্রের লোক? আমি বললাম, আসলাম গোত্রের। তিনি (সা.) বললেন, (আমরা) নিরাপদ। এরপর জিজ্ঞেস করেন, কার সন্তান? আমি বললাম, বনু সাহামের সন্তান। তিনি (সা.) বললেন, হে আবু বকর! তোমার সাহাম, অর্থাৎ তোমার ভাগ্য প্রসন্ন হলো। পরে বুরায়দা মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কে? তিনি (সা.) বলেন, আমি আল্লাহ্র রসূল মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্। তখন বুরায়দা বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ভিন্ন কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল। এর পরবুরায়দা এবং তার সাথে যারা ছিল তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করে। বুরায়দা বলেন, সব প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লার, বনু সাহাম স্বেচ্ছায় ও সানন্দে এবং কোন ধরণের জোরাজুরি ছাড়াই ইসলাম গ্রহণ করে। সকাল হলে বুরায়দা বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! মদীনায় প্রবেশের সময় আপনার সাথে একটি পতাকা থাকা উচিত। এরপর তিনি তাঁর পাগড়ি মাথা থেকে খুলে সেটিকে নিজ বর্শায় বেঁধে দেন এবং মহানবী (সা.)-এর সামনে হাঁটতে থাকেন যতক্ষণ না মুসলমানরা মদীনায় প্রবেশ করেছে।

(শারহা যারকানী আলা মোয়াহিবুল লাদানি, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৪৮) (আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৭)

সহীহ্ বুখারীতে রসূলু ল্লাহ্ (সা.)-এর মদীনায় আগমন সম্পর্কে হযরত আনাস বিন মালেক (রা.)-এর এরূপ একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে, মহানবী (সা.) মদীনায় আসেন এবং মদীনার উঁচু এলাকায় বনু আমর বিন অওফ নামে খ্যাত একটি গোত্রের জনবসতিতে আসেন। মহানবী (সা.) তাদের মাঝে চৌদ্দ রাত অবস্থান করেন। এরপর বনু নাজ্জার গোত্রকে ডেকে পাঠান। তারা তরবারিতে সজ্জিত হয়ে আসে। এই ঘটনা আমার এত ভালোভাবে মনে আছে যে, এখনো যেন আমি মহানবী (সা.)-কে তাঁর বাহনে বসা অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। হযরত আবু বকর তাঁর (সা.) পেছনে বসে ছিলেন এবং তাঁর (সা.) চারপাশে বনু নাজ্জারের লোকেরা ছিল। অবশেষে তিনি (সা.) হযরত আবু আইয়ুব (রা.)-এর উঠানে শিবির স্থাপন করেন।

(সহীহ আল বুখারী, কিতাবুস সালাত, হাদীস-৪২৮)

এই ঘটনাটি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লেখেন, "কুবায় দশদিনের বেশি অবস্থানের পর জুমুআর দিন মহানবী (সা.) মদীনার কেন্দ্রের দিকে যাত্রা করেন। আনসার ও মুহাজিরদের একটি বড় দল তাঁর (সা.) সাথে ছিল। তিনি (সা.) একটি উটনিতে আরোহিত ছিলেন এবং হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর পেছনে বসেছিলেন। এই কাফেলা ধীরে ধীরে শহরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। পথিমধ্যে জুমুআর নামাযের সময় হলে মহানবী (সা.) বনু সালেম বিন অওফের পাড়ায় যাত্রা বিরতি দেন আর সাহাবীদের উদ্দেশ্যে খুতবা দেন এবং তা দেরকে সাথে নিয়ে জুমুআর নামায পড়েন। ঐতিহাসিকেরা লিখেছেন, যদিও এর পূর্বেই জুমুআর প্রচলন হয়ে গিয়েছিল তবুও এটিই সেই প্রথম জুমুআ ছিল যা তিনি (সা.) স্বয়ং পড়ান আর এরপর থেকে নিয়মিতভাবে জুমুআর নামাযের প্রচলন হয়ে যায়।" (এখান থেকেও বুঝা যায় সেই মসজিদটি পরে বানানো হয়েছিল।)

"জুমুআ শেষে মহানবী (সা.)-এর কাফেলা পুনরায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। পথিমধ্যে তিনি (সা.) যখন মুসলমানদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তারা ভালোবাসার আতিশয্যে এগিয়ে এসে নিবেদন করছিলেন যে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! এ হলো আমাদের বাড়িঘর। আমাদের সম্পদ ও প্রাণ আপনার সেবায় নিবেদিত, আর আমাদের কাছে সুরক্ষা বিধানের ব্যবস্থাও রয়েছে; আপনি আমাদের কাছে অবস্থান করুন! তিনি (সা.) তাদের মঙ্গলের জন্য দোয়া করেন এবং ধীরে ধীরে শহরের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। মুসলমান নারী ও মেয়েরা আনন্দের আতিশয্যে বাড়ির ছাদে উঠে গাইতে থাকে-

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ
وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَى لِلّٰهِ دَاعِ

অর্থাৎ আমাদের ওপর আজ বিদা পাহাড় থেকে চতুর্দশী চাঁদ উদিত হয়েছে। এজন্য আমাদের জন্য খোদা তা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ চিরদিনের জন্য আবশ্যক হয়ে গিয়েছে। মুসলমান শিশুরা মদীনার অলিতে গলিতে গাইতে লাগল "মুহাম্মদ (সা.) এসে গেছেন, খোদার রসূল এসে গেছেন"। আর মদীনার হাবশি দাসরা রসূল করীম (সা.)-এর আগমনের খুশিতে তরবারির বিভিন্ন কসরত দেখাচ্ছিল।

মহানবী (সা.) যখন শহরে প্রবেশ করেন তখন প্রত্যেকের মনোবাসনা এটিই ছিল যে, তিনি (সা.) যেন তার বাড়িতেই অবস্থান করেন আর সবাই প্রতিযোগীতমূলক ভাবে নিজেদের সেবা উপস্থাপন করছিল। সবার সাথেই তিনি (সা.) হৃদ্যতাপূর্ণ কথা বলতে বলতে সামনে অগ্রসর হন। এভাবে তাঁর (সা.)-এর উষ্ট্রী বনু নাজ্জারের পাড়ায় গিয়ে পৌঁছে। সেখানে বনু নাজ্জারের লোকেরা রসূল (সা.) কে স্বাগত জানানোর জন্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিল আর গোত্রের মেয়েরা ঢোল বাজিয়ে এই পংক্তি পড়ছিল যে

نَحْنُ جَوَارٍ مِنْ بَنِي نَجَّارِ يَاحَبَّذَا مُحَمَّدًا مِنْ جَارِ

অর্থাৎ আমরা বনু নাজ্জারের মেয়েরা কতইনা ভাগ্যবতী যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের পাড়ায় অবস্থানের জন্য এসেছেন।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ, পৃ: ২১৬-২১৭)

মহানবী (সা.)-এর নিজের এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর পরিবার পরিজনকে মদীনায় ডেকে পাঠানোর ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "কিছুদিন পর, অর্থাৎ মদীনায় আগমনের কিছুদিন পর তিনি (সা.) তাঁর মুক্ত ক্রীতদাস যায়েদ (রা.) কে মক্কায় প্রেরণ করেন যাতে তিনি তাঁর (সা.)-এর পরিবার পরিজনকে নিয়ে আসেন। যেহেতু মক্কাবাসীরা এই আকস্মিক হিজরতের কারণে কিছুটা আতঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল তাই কিছুদিনের জন্য অত্যাচার নির্যাতন বন্ধ ছিল আর এই আতঙ্কের কারণেই তারা রসূল করীম (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর পরিবারের মক্কা ত্যাগের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয় নি। ফলে তারা নিরাপদে মদীনায় পৌঁছে যান। এরই মধ্যে রসূল করীম (সা.) যে জমি ক্রয় করেছিলেন সেখানে সর্বপ্রথম তিনি (সা.) মসজিদের ভিত্তি রাখেন আর এরপর নিজের এবং নিজ সঙ্গীসাথিদের জন্য বাড়ি নির্মাণ করেন।

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ২৩০)

মদীনা হিজরতের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) সুনআয় হযরত খুবায়েব বিন ইসাফ (রা.)-এর বাড়িতে উঠেন।

সুনআ মদীনার শহরতলির একটি জায়গা যা মসজিদে নববী থেকে প্রায় দুই মাইল দূরের অবস্থিত। হযরত খুবায়েব (রা.) বনু হারেস বিন খাযরাজ গোত্রের সদস্য ছিলেন। এক বর্ণনা অনুসারে হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খারেজা বিন যায়েদ (রা.)-এর গৃহে অবস্থান নিয়েছিলেন।

(আসসীরাতনু নবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৩৪৮)

কতক রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত আবু বকর (রা.) সুনআতেই তার বাড়ি এবং কাপড় বানানোর কারখানা বানিয়েছিলেন আর এখান থেকেই ব্যবসাবাণিজ্য করেছেন।

(মাকালাতে সীরাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৩১)

ইনশাআল্লাহ্ আগামীতেও এই স্মৃতিচারণ অব্যহত থাকবে।

এ পর্যায়ে আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করতে চাই। এদের মধ্যে প্রথমজন হলেন মরহুম চৌধুরী আসগর আলী কালার সাহেব, যিনি আল্লাহ্‌র রাস্তায় কারাবরণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তিনি ভাওয়ালপুরের মুহাম্মদ শরীফ কালার সাহেবের পুত্র ছিলেন। ১০ই জানুয়ারী তারিখে বন্দী অবস্থায় তিনি অসুস্থ হন এবং সে অবস্থাতেই তিনি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি শহীদ হিসাবেই গণ্য হবেন।

বিস্তারিত বিবরণ অনুসারে মরহুমের বিরুদ্ধে ২০২১ সালে ২৪ সেপ্টেম্বরে ভাওয়ালপুরের বাগদাদ আলজাদীদ পুলিশ স্টেশনে ২৯৫ সি ধারায় রসূল অবমাননার (তথাকথিত) অভিযোগে এই আইনের অধিনে মামলা দায়ের হয় এবং ২৬ সেপ্টেম্বর তাকে গ্রেফতার করা হয়। এরা আহমদীদের বিরুদ্ধে রসূল অবমাননার অভিযোগ উত্থাপন করতে আর দেরি করে না। গ্রেফতারির পর মরহুম ভাওয়ালপু র জেলখানায় ছিলেন। জেলখানায় রক্তবমি এবং স্ব াস্থ্যের অবনতি হওয়ায় মরহুমকে ৪ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে ভাওয়ালপুর হাসপাতালে স্থ ানান্তরিত করা হয়, সেখানে চিকিৎসা চলতে থাকে। অবশেষে ১০ জানুয়ারি সকালে ফজরের পূর্বে সেখানে তিনি বন্দী অবস্থাতেই ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। মৃত্যুকালে মরহুমের বয়স ছিল ৭০ বছর।

মরহুমের জামানতের আবেদন আদালতে শুনানির অপেক্ষায় ছিল আর ৮ জানুয়ারি তার জামানতের তারিখ ছিল কিন্তু পুলিশ নথিপত্র নিয়ে আসে নি তাই জজ ১১ জানুয়ারি জামানতের তারিখ প্রদান করে কিন্তু সিন্ধান্তের পূর্বেই মরহুম চিরসত্য মনিব (আল্লাহ তা'লার) সকাশে উপস্থিত হয়ে যান। মরহুম আল্লাহর সন্তুষ্টির সন্ধানে তিন মাস পনেরো দিন বন্দীদশায় ছিলেন।

মরহুম তার জীবনের শুরুর দিকেই তথা মেট্রিকের পর ১৯৭১ সালে বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া জামাভুক্ত হয়েছিলেন। তিনি তার পরিবারে একা আহমদী ছি লেন। আহমদীয়াত গ্রহণের পর পরিবারে বিরোধিতাপূর্ণ পরিবেশের সম্মুখিন হতে হয় কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি অবিচল ছিলেন। লাহোর এফসি কলেজ থেকে তিনি গণীতে এমএসসি ডিগ্রি করেন। আহমদীয়াত গ্রহণের কারণে পড়ালেখায় থাকাকালিন সময়ে পিতাপাতা তার আর্থিক সহায়তা বন্ধ করে দেয় এবং শর্ত আরোপ করে যে, আহমদীয়াত পরিত্যাগ করলে পরেই পরবর্তী পড়ালেখার খরচাদি প্রদান করা হবে। এতদসত্ত্বেও মরহুম সত্যের ওপর অবিচল থাকেন এবং বাচ্চাদের প্রাইভেট পড়িয়ে নিজের পড়ালেখার ব্যায় নির্বাহ করতেন। মরহুমের পিতা তার তাকওয়া ও অবিচলতায় প্রভাবিত হয়ে পরবর্তীতে তার বিরোধিতা পরিত্যাগ করেন। আর এই আশঙ্কাকে দৃষ্টিপটে রেখে যে, পাছে আহমদী ছেলেকে অ-আহমদী পিতার সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়, তার পিতা নিজ জীবদ্দশাতেই তার প্রাপ্য অংশ তাঁকে লিখে দেন। তার সাথে এই একটি ভালো কাজ তার পিতা করেছেন। মরহুম আল্লাহ কৃপায় এক অষ্টমাংশের ওসিয়্যত করেছিলেন। আর্থিক তাহরীকসমূহে তিনি উৎসাহউদ্দীপনার সাথে অংশ নিতেন। নতুন বছরের ঘোষণা হতেই তিনি শতভাগ চাঁদা দিয়ে দিতেন। খেলাফতে আহমদীয়ার সাথে গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। ওয়াকেফে জিন্দেগী এবং কেন্দ্রীয় অতিথীবর্গের সম্মান ও আতিথেয়তার উল্লেখযোগ্য গুণ তার মাঝে ছিল। জামাতী সফরে তিনি সর্বদাই নিজের গাড়ী ব্যবহারের জন্য প্রদান করতেন। তবলীগের প্রতি তার বেশ আগ্রহ ছিল। নির্ভিক ও সাহসী দাঈ ইলাল্লাহ ছিলেন। মরহুমের মাধ্যমে আল্লাহ তা'লা অনেক পুণ্যবান ব্যক্তিকে বয়আত করে আহমদীয়াতে অংশগ্রহণের তৌফিক দান করেছেন। নামায রোযা ছাড়াও নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। দরিদ্রদের সাহায্যকারী এবং সৃষ্টির সেবাকারী পরপোকারী একজন মানুষ ছিলেন। বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি পরিবারের সবাইকে আর্থিক ও নৈতিক সেবা দানের তৌফিক পেয়েছেন। মরহুম শাহাদত বরণের আকূর বাসনা রাখতেন যা অবশেষে আল্লাহ তা'লা এভাবে পূর্ণ করেছেন।

মরহুমের স্ত্রী বর্ণনা করেন, জেলখানায় সাক্ষাত কালে মরহুম বলেছেন যে, আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে তিনি তিনবার সালাম-এর বার্তা পেয়েছেন। তিনি বলেছেন, অন্য একটি স্বপ্নে তিনি জেলখানা থেকে তার লাশ বের হতে দেখেছেন। মরহুম নাযেম আনসারুল্লাহ, যয়ীমে আলা ভাওয়ালপুর শহর, সেক্রেটারি দাওয়াতে ইলাল্লাহ, সেক্রেটারি ওয়াকফে জাদীদ, জেলা সেক্রেটারি ইসলাহ ও ইরশাদ পদে থেকে জামাতের কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। মৃত্যুকালে তিনি জেলার কাজীও ছিলেন। পরিবারে মরহুম স্ত্রী ছাড়াও দুই পুত্র ও এক কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। মরহুমের ছেলে দেশের বাইরে আছে আর মেয়েও কানাডায় থাকে। আল্লাহ তা'লা আসগর আলী ক্লার সাহেবের সাথে কৃপা ও দয়ার আচরণ করুন এবং তার মর্যাদা উন্নীত করুন। তার রেখে যাওয়া পরিবারকে ধৈর্য দিন এবং তার পদাঙ্ক অনুসরণের তৌফিক দান করুন। দোয়া করুন, আল্লাহ তা'লা যেন অন্যান্য আসীরান তথা বন্দীদেরও মুক্তির সুযোগ সৃষ্টি করেন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ মির্যা মুমতাজ আহমদ সাহেবের যিনি ওকালাতে উলিয়া, রাবওয়ার একজন কর্মী ছিলেন। ৮৫বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি মূসী ছিলেন। তার বংশে আহমদীয়াত তাঁর পিতা ক্যাপ্টেন ডাক্তার শের মুহাম্মদ আলী সাহেবের মাধ্যমে আসে যিনি ১৯২৩সনে বয়আত করেছিলেন। মির্যা মুমতাজ সাহেব ১৯৬৪ সালে তাহরীকে জাদিদের আমনত দপ্তরে লিপিকার হিসাবে কাজ আরম্ভ করেছিলেন এবং আমৃত্যু তথা ৫৮ বছর এ কাজ করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। তার বিয়ে মুকাররম চৌধুরী মুজাফফর উদ্দিন বাঙ্গালী সাহেবের কন্যা মাজেদা বেগমের সাথে হয়েছে। তার মাধ্যমে আল্লাহ তা'লা তাকে দুই পুত্র এবং এক কন্যা সন্তান দান করেছেন।

তার দৌহিত্র খালেদ মনসুর লিখছেন, নানা আমাদেরকে সর্বদা জামাতের সেবায় সম্পৃক্ত থাকার আমার পিতার মৃতু্যর পর তিনি আমাকে তার অভাব অনুভব করতে দেননি। সর্বদা তাকে বন্ধুরূপে পেয়েছি। সর্বদা জামাতের কাজে ব্যস্ত দেখেছি। একজন আদর্শ বন্ধু ও পিতা এবং জামাতের একজন আদর্শ কর্মী ছিলেন। প্রত্যেকের সাথে সম্প্রীতি, ভালবাসা ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করতেন। খুবই সময়নুবতী ছিলেন এবং সময়নুবর্তিতার গুরুত্ব বুঝাতেন।

তার সহকর্মী সাইদ নাসের সাহেব বলেন, দীর্ঘকাল তার সাথে আমার কাজ করার সুযোগ হয়েছে। খুবই নিষ্ঠা ও পরিচ্ছন্নতার সাথে কাজ করতেন এবং নিজের কাজ সম্পন্ন করার পর নিজ সহকর্মীদের কাজেও সাহায্য করতেন।

এরপর লুকমান সাকেব নামের একজন মুরুব্বি সাহেব বলেন, আমি দেখেছি, স্বাস্থ্যগত দুর্বলতা সত্ত্বেও তার ওপর ন্যস্তদায়িত্ব পূর্ণ সচেতনতার সাথে সুচারুরূপে সম্পন্ন করতেন। শেষ সময় পর্যন্ত স্মরণশক্তি খুবই ভালো ছিল। কয়েক বছর পূর্বের কোন বিষয়েও তৎক্ষণাৎ বলে দিতেন যে, এই এটি অমুক স্থানে অমুক ফাইলে আছে। পরিচ্ছন্ন রসিকতা পছন্দ করতেন এবং উপভোগ করতেন। কিন্তু বিনা কারণে অনর্থক কথা বলা, আড্ডাবাজি করা তার

স্বভাবে ছিল না। নিজ কাজ সম্পন্ন করার পর যে সময় অবশিষ্ট থাকত অফিসের চেয়ারে বসে পুরোনো কোন ফাইল পড়া আরম্ভ করতেন।

ডা. সুলতান মোবাশ্বের তার সম্পর্কে লিখেন, অত্যন্ত বিনয়ী মানুষ ছিলেন। একজন সিনিয়র কর্মী হওয়া সত্ত্বেও হাসপাতালে যখন আসতেন নিজ সিরিয়ালের অপেক্ষা করতেন এবং তাড়াহুড়া করতেন না। কৃতজ্ঞতাবোধের বিশেষ গুণ তার মাঝে ছিল। তিনি পরম ধৈর্য্যশীল ছিলেন। দীর্ঘ অসুস্থতার অতিশয় কষ্ট সত্ত্বেও তিনি অধৈর্য্য হন নি এবং অফিসের কয়েকজন বন্ধু ছাড়া তাঁর খুব বেশি বন্ধবান্ধব ছিল না।

আমিও দেখেছি, খুবই নীরব প্রকৃতির মানুষ ছিলেন এবং নিজের কতিপয় বন্ধুর সাথে ওঠাবসা করতেন। ঘর থেকে অফিস, অফিস থেকে ঘর আসা যাওয়াই তার নিত্যদিনের রীতি ছিল। কিন্তু অনেক পরিশ্রমের সাথে কাজ করতেন। পরিশ্রম, নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার সাথে জীবনযাপন করেছেন।

আল্লাহ তা'লা ক্ষমা এবং দয়ার আচরণ করুন। তার সন্তানদেরও তার পুণ্য ধরে রাখার তৌফিক দিন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হবে অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল ডা. আব্দুল খালেক সাহেবের। তিনি ফজলে উমর হাসপাতালে সাবেক এডমিনিস্ট্রেটর ছিলেন। সম্প্রতি তিনি ৯৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ তা'লার কৃপায় তিনি মূসী ছিলেন। তার বংশে আহমদীয়াত তার পিতা মিয়া মুহাম্মদ আলম সাহেব এর মাধ্যমে এসেছে যিনি ১৯১৯ সালে বয়আত করেছিলেন আর ডাক্তার আব্দুল খালেক সাহেব ১৯৩৮ সালে বয়আত করেছিলেন। নিজ বয়আতের বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, আমাদের শ্রদ্ধেয় পিতা আল ফজল পত্রিকা আনাতেন। এটি অধ্যয়নের ফলে আহমদীয়াতের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এবং ১৯৩৮ সালে আমরা বয়াত করি। (আমাদের) মা নিয়মিত নামায ও রোযা পালনকারিণী ছিলেন। আমাদের বয়াতের কিছু দিন পর তিনিও বয়াত করে নেন। ১৯৩৯ সালের জুবিলীর জলসায় আমি প্রথমবার কাদিয়ানে যাই আর এরপর থেকে প্রায় জলসায় যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি। ১৯৮৭ সালে তার স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেন। তার দুই ছেলে দুই মেয়ে রয়েছে।

তার এক ছেলে ডাক্তার আব্দুল বারী জামাতে আহমদীয়া ইসলামাবাদের আমীর। ১৯৭৪ সালে ভুট্টো সরকার আহমদীদের অমুসলিম ঘোষণা করার অন্যায় আইন পাশ করলে ডাক্তার সাহেব ইস্তফা দিয়ে দেন এবং নুসরাত জাহান স্কীমের অধীনে জামাতের সেবা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ১৯৭৭ সালে তাকে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সিয়েরালিওনে প্রেরণ করা হয় যেখানে তিনি তিন বছর পর্যন্ত মানব সেবা করার তৌফিক লাভ করেন। অতঃপর ১৯৯২ সালে তাশকান্দে পি.আই.এ বিমান পরিসেবা চালু হলে ডাক্তার সাহেব এই সুযোগকে যাথোপযুক্ত মনে করে তাশকান্দ ও উজবেকিস্তানে ওয়াকফে আরজির আবেদন করেন। কেন্দ্র তার আবেদন মঞ্জুরী প্রদান করলে, তার ছোট বোনকে সাথে নিয়ে সমরকন্দ ও বুখারায় তিনি ওয়াকফে আরজি করেন আর এ সময় (তিনি) নিঃস্বার্থভাবে মানবসেবার কাজ করেন। আহমদীয়াতের বাণী পৌছানোর সৌভাগ্য-ও তিনি লাভ করেন। ১৯৯৪ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাকে রাবোয়ার ফযলে ওমর হাসপাতালের প্রশাসক নিযুক্ত করেন। যেখানে তিনি প্রায় দশ বছরের বেশি সময় কাজ করার তৌফিক লাভ করেন। তার যুগে ফযলে ওমর হাসপালের সম্প্রসারণ ও নির্মাণের অনেক প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়। কোনও এক যুবক তার সম্পর্কে লিখেছে যে, আশি, একাশি বছর বয়সে উপনীত হয়ে-ও তার সেবার স্পৃহা যুবকের (মতো) ছিল। কিন্তু এই উপলব্ধিও ছিল যে, আমি বৃদ্ধ হচ্ছি। তাই তিনি ২০০৫ সালে অবসরের আবেদন করে আমাকে জানালে তার অবসর মঞ্জুর হয়ে যায়। তিনি স্থায়ীভাবে ইসলামাবাদে বসবাস করা আরম্ভ করেন। ইসলামাবাদে তিনি স্থানীয় কাজী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

তার বড় ছেলে ডাক্তার আব্দুল বারী সাহেব বলেন, সন্তানের ধর্মীয় ও চারিত্রিক তরবিয়তের দিকে সর্বদা তিনি খেয়াল রাখতেন। সকাল-সন্ধা বরং সবসময় তিনি কুরআন তিলাওয়াতে রত থাকতেন এবং (এটি তার) অনেক প্রিয় হবি ছিল। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়দিতে তিনি সকল সিদ্ধান্ত পবিত্র কুরআনের (শিক্ষার) আলোকেই গ্রহণ করতেন।

তার জামাতা ওয়াকেন্ট জেলার নায়েব আমীর ডাক্তার মুজাফ্ফার আলী নাসের সাহেব বলেন, আজ অবধী কাউকে সারা দিন এত কুরআন তিলাওয়াত করতে দেখিনি। কুরআনের সাথে তার (গভীর) ভালোবাসা ছিল। একবার হাসপাতাল থেকে (তাকে) ডিসচার্জ করা হলে স্টাফদের মন খারাপ হয়ে যায় যে, আমাদেরকে কে কুরআন শোনাবে? শীত ও গ্রীস্মে তার নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়া আমাদের জন্য একটি আদর্শস্থানীয় দৃষ্টান্ত ছিল। খিলাফত ও জামাতের সাথে তার গভীর ভালবাসা ছিল। অত্যন্ত সাদামাটা জীবন যাপন করতেন এবং কখনো কোন অভিযোগ করেননি।

তার ভাইয়ের দৌহিত্র আব্দুস সামাদ রেজভি লিখেছেন, তিনি মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করেছেন। নিজের সুঃখ ও আনন্দকে বিসর্জন দিয়েছেন। রাবোয়ায় তার বাসায় আমার কয়েকবার থাকার সুযোগ হয়েছিল, তার সত্ত্বা আমার জন্য জীবন্ত খোদাকে চেনার কারণ হয়েছিল। তার তাহাজ্জুতের নামায ছিল অতুলনীয়। খিলাফতের প্রতি তার ছিল গভীর সম্মান ও ভালোবাসা, যা আমাদের সর্বোত্তম তরবীয়তের কারণ হয়েছে।

ফযলে ওমর হাসপাতালের ডাক্তার অব্দুল খালেক বলেন, (মরহুম) ডাক্তার সাহেব নবীন ডাক্তারদের প্রতি স্নেহশীল ছিলেন আর নবীন ডাক্তারদের প্রশিক্ষণের বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখার জন্য সিনিয়র ডাক্তারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। হাসপাতালের সম্পদ সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে দেখাশোনা ও রক্ষণাবেক্ষন করতেন। নিজের পক্ষ থেকে গরীব ও অভাবীদের সাহায্য করতেন।

ডাক্তার মুহাম্মদ আহমদ আশরাফ বলেন, (মরহুম) অত্যন্ত ধৈর্যশীল ছিলেন। (মরহুম) কোমল হৃদয়ের অধিকারী, সহিষ্ণু এবং পরম স্নেহশীল মানুষ ছিলেন। তিনি সল্পভাষী ছিলেন কিন্তু ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকে ছোট ছোট বিষয়ের প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখতেন এবং নিয়মনীতি পালন করাতেন। অন্যান্য ডাক্তারদেরকে এবং নিজের জামাতা ও ছেলেদেরকে ফযলে ওমর হাসপাতালে ওয়াকফে আরজি করার জন্য আহ্বান জানাতেন।

মহান আল্লাহ্ মরহুমের সাথে ক্ষমা এবং দয়ার আচরণ করুন, তার সন্তানদের মাঝেও তার পুণ্যসমূহ অব্যহত রাখুন।

(জুমা) নামাযের পর তাদের নামাযে জানাযা আদায় করব।

****

১ম পাতার পর.....

জীবিত হওয়াও প্রয়োজনীয় শর্ত, যাতে কোন সমস্যার সৃষ্টি হলে সংশোধন করতে পারে। এই দলিল দ্বারা মিথ্যা উপাস্যদের পথপ্রদর্শনকারী হওয়ার যোগ্যতাকে অস্বীকার করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তোমরা যাদের উপাসনা কর তারা সকলে মৃত্যু বরণ করেছে। তারা কিভাবে পথপ্রদর্শনকারী হতে পারে! যদি এই যুগে কোন বিকৃতি দেখা দেয় তবে কিভাবে তার সংশোধন হবে? আশ্চর্যের বিষয় হল মুসলমানদের মধ্যে এই নির্দেশের বিরুদ্ধেও মতবাদ তৈরী হচ্ছে এবং বিপুল সংখ্যক মানুষ হযরত ঈসা (আ.) কে জীবিত বলে বিশ্বাস করে। অথচ আল্লাহ্ তা'লা বলেন, কুরআন মজীদের যুগে যতসব মিথ্যা উপাস্য ছিল তারা সকলেই মারা গেছে। অতএব, এরা যেহেতু হযরত ঈসা (আ.) কে উপাস্য বলে মান্য করত, তাই এই ঐশী সাক্ষ্য অনুসারে তারা কুরআন করীম অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই মৃত্যু বরণ করেছিল। আর যদি তাদেরকে জীবিত বলে মেনে নেওয়া হয়, তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে, নাউযু বিল্লাহ্ তারা মিথ্যা উপাস্য ছিল না। বরং সত্যিকার খোদা ছিল। নাউযু বিল্লাহ মিন যালিক।

এই দুটি আয়াতে শক্তিশালী যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা শিরকেরও খণ্ডন করা হয়েছে। এর চারটি দলিল দেওয়া হয়েছে।

১) লা- ইয়াখলুকুনা। অর্থাৎ তারা সৃষ্টি করে না। অথচ খোদা হওয়ার জন্য স্রষ্টা হওয়া আবশ্যিক শর্ত। কেননা পরিপূর্ণ সত্তাই উপাস্য হতে পারে। ২) তাদের নিজেদেরকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে অপরের উপর নির্ভরশীলতা পাওয়া যায়। আর অপরের উপর নির্ভরশীল বা কারো মুখাপেক্ষী সত্তা অসম্পূর্ণ হয়ে থাকে, উপাস্য হতে পারে না। ৩) তারা জীবিত নয়, মৃত। অর্থাৎ সেই যুগে তারা উপকারীও নয় আবার ক্ষতিকরও নয়। আর সেই সত্তাই খোদা হতে পারে যার মধ্যে কল্যাণ ও অকল্যাণ করার শক্তি রয়েছে। ৪) তারা এতটুকুও জানে না যে তাদের উত্থান কবে হবে। তাদেরও চূড়ান্ত পরিণতিও অপরের উপর নির্ভরশীল। শেষোক্ত দলিলের সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, একথার প্রমাণ কি যে, কবে তারা উত্থিত হবে সেকথা তাদের অজানা? এর উত্তর হল, সব থেকে বেশি পূজিত সত্তা হযরত মসীহ, যিনি পুনরুত্থান দিবস সম্পর্কে স্বয়ং বলছেন-

'কিন্তু সেই দিন কিম্বা সেই মুহূর্ত সম্পর্কে কেউ জানে না। আকাশের ফিরিশতা কিম্বা পুত্র কেউই জানে না, কিন্তু পিতা জানেন। সাবধান! জাগ্রত থাক এবং দোয়া প্রার্থনা কর। কেননা তোমরা জান না যে, সেই সময় কখন উপস্থিত হবে?"

(মরকস, অধ্যায় ১৩, আয়াত: ৩২-৩৩)

অতএব হযরত ঈসা (আ.)-এর এই স্বীকারুক্তির মধ্য দিয়ে খোদা হিসেবে স্বীকৃত অন্যান্য ব্যক্তিদের সম্পর্কেও এই ধারণা করা যেতে পারে।

(তফসীরে কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৫১)

দেখনদারির উদ্দেশ্যে মোহর ধার্য করা অনুচিত।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

পারস্পরিক সহমতি নিয়ে যেটা হয় তাতে কোন অসুবিধে নেই। আর শরিয়ত সম্মত মোহর বলতে একথা বোঝায় না যে, কুরআন এবং হাদীসে এর কোন সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। বরং এর দ্বারা সেই যুগের মানুষের প্রচলিত মোহরকে বোঝানো হয়েছে। আমাদের দেশের এটাই দোষ, এর পেছনে উদ্দেশ্য অন্য কিছু থাকে আর শুধুমাত্র প্রদর্শনের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা মোহর ধার্য করা হয়। শুধু ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এটা লেখা হয় যাতে পুরুষ নিয়ন্তণে থাকে। এর ফলে অন্যান্য মন্দ পরিণাম প্রকাশ পেতে পারে।

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৮৪)

(রিশতা-নাতা বিভাগ, নাযারত ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া কাদিয়ান)

তাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে এসেছিল, সে বলল, আমাকে আল্লাহ্ পাঠিয়েছেন রাস্তা মেপে দেখতে। অপর ফিরিশতা বলল, বেশ তাই হোক। অতঃপর রাস্তা মেপে দেখার বিষয়ে এই সিদ্ধান্ত হল যে, যদি সেই শহরটি কাছে হয় যার উদ্দেশ্যে সে পাপের ক্ষমার জন্য রওনা দিয়েছিল, তবে সে জান্নাতে যাবে। আর যেখান থেকে মানুষ খুন করে সে বের হয়েছিল, সেই শহরটি যদি কাছে হয় তবে তাকে দোযখে দেওয়া হবে। এরপর যেমনটি আমি বললাম, আল্লাহ্ তা'লা সেই দূরত্ব কম করে দিলেন আর যখন মেপে দেখা হল তখন সেই শহরটি নিকটবর্তী হয়ে গেল যেখানে পাপের ক্ষমার জন্য যাচ্ছিল। আর সেই দূরত্ব ছিল মাত্র এক বিঘ। (হুযুর আনোয়ার তার হাতের এক বিঘ বানিয়ে আতফালদের দেখিয়ে বললেন) কেবল এতটুকু দূরত্ব কম ছিল আর অপরদিকে তা বেশি ছিল। এই কারণে আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা করে দিলেন এবং জান্নাতে নিয়ে গেলেন। এটি হল আল্লাহ্ তা'লার করুণা। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, একব্যক্তি কাউকে প্রশ্ন করেছিল যে, আমাকে কি ক্ষমা করা হবে? সে উত্তরে বলেছিল, তুমি ঘোর পাপী, তোমাকে ক্ষমা করা যেতে পারে না। তখন সেই পুন্যবান এবং নামাযী ব্যক্তি, যে নিজেকে ভীষণ পুণ্যবান বলে মনে করত, আল্লাহ্ তা'লা তাকে বললেন, কে জান্নাতে যাবে আর কে জাহান্নামে যাবে তার বিচার করার তুমি কে? দৈবক্রমে তারা একত্রে মারা যায়, এবং আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হল, তখন আল্লাহ্ তা'লা সেই পুণ্যবান ব্যক্তিকে যে পাপী ব্যক্তিটিকে বলেছিল যে সে নাকি দোযখে যাবে আর সে নিজে জান্নাতে যাবে, একথা সে নিশ্চিত করে বলতে পারে, বললেন, তুমি কোথা থেকে নিশ্চয়তা দিচ্ছ? চলো, আমি তোমাকে দোযখে পাঠাচ্ছি আর যার জন্য তুমি বলছিলে যে সে নাকি দোযখে যাবে, আর তুমি জান্নাতে যাবে, আমি তাকে জান্নাতে পাঠাব। এটিই আল্লাহ্ তা'লার দয়া। তাই আমাদের কাজ হল আল্লাহ তা'লা যেন সন্তুষ্ট থাকেন তার জন্য চেষ্টা করা। আল্লাহ্ তা'লাও সব কিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত, কিন্তু তিনি সমস্ত কিছুর উপর শক্তিমান। আল্লাহ্ তা'লা অযাচিত দাতাও বটে এবং অপরদিকে তিনি পরম করুনাময়। তিনি ক্ষমাশীলও বটে। সব শেষে তিনি নিজের সিদ্ধান্ত বদল করে তকদীরও পরিবর্তন করতে পারেন। যেহেতু তিনি সর্বশক্তিমান, তাই তিনি নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার শক্তিও রাখেন। এখন তোমরা যদি বল যে, আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন যে আমরা দোযখে যাব, তাই পাপ কর, এতে কিছু হবে না। এত কিছু যখন করেই ফেলেছি, আল্লাহ কি আমাদের রেহাই দিবেন? কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তোমরা চেষ্টা কর, আমিও তোমাকে ক্ষমা করতে পারি। এই জন্য চেষ্টা করা উচিত যে আল্লাহ্ যেন প্রথমেই ক্ষমা করে দেন। আর মানুষের এই দোয়া চাওয়া উচিত যে তার পরিণতি যেন শুভ হয় এবং শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সে সৎকর্ম করে চলে। এই কারণে আমাদের চেষ্টা করে চলা উচিত। আল্লাহ্ তা'লার ক্ষমতা রয়েছে তো। তিনি সর্বাধিপতি। তিনি সব কিছু করতে পারেন। তিনি সবার শেষে তোমাদের ক্ষমাও করে দিতে পারেন। তোমরা মনে কর যে তোমাদের তকদীরের সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে, তোমরা পাপী। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি যদি একশ ব্যক্তির হত্যাকারীকে ক্ষমা করতে পারি, তবে তোমাদেরকেও ক্ষমা করতে পারি।

প্রশ্ন: সেই ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানেই আরও এক তিফল প্রশ্ন করে যে, কোরোনা ভাইরাস মহামারি শেষ হওয়ার পর পৃথিবী কি পূর্বের মতই স্বাভাবিক হতে পারবে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: এটা তো আল্লাহই ভাল জানেন। স্বাভাবিক হয়ে যাবে, কিন্তু কোরোনা ভাইরাসজনিত এই মহামারি-উত্তর পৃথিবীর অর্থনীতি এর দ্বারা প্রভাবিত হবে। আর প্রভাব না পড়লেও বা কোন যুদ্ধ সংঘটিত না হলেও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আসতে কয়েক বছর লেগে যাবে। কিন্তু সচরাচর দেখা গেছে যে, এমন পরিস্থিতিতে অর্থনীতির স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং যুদ্ধের পরিস্থিতিরও উদ্ভব হয়। সাম্প্রতিক কালের পরিস্থিতি অনুসারে যুদ্ধের আবহ তৈরী হচ্ছে। আর কোরোনার পর যুদ্ধ হলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হবে এবং তা স্বাভাবিক হতে আরও অনেক সময় লেগে যাবে। এই কারণে আমাদের এই দোয়া করা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা জগতবাসীকে বিবেক দিন। আর জগবাসী যদি জাগতিকতার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে এবং একে অপরের অধিকার আত্মসাৎ না করে বিবেচনা করে আর তাদের নেতারা বিবেচনা করে এবং শান্তিতে ও নির্বিঘ্নে থাকার চেষ্টা করে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকার চেষ্টা করে, জগতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করে, তবে পরিস্থিতি দ্রুতি স্বাভাবিক হবে। কিন্তু তারা চেষ্টা না করলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে না, এর জন্য বহু বছর সময় লাগবে এবং ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি দেখা দিবে। আমার আশঙ্কা হয়, কোরোনা ভাইরাস শেষ হওয়ার পর আবার যুদ্ধ পরিস্থিতির উদ্ভব না হয়। এই জন্য আমাদের দোয়া উচিত যে, আল্লাহ না করুন যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরী হোক। আর বিশ্বনেতারা বিবেক করুক আর পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক ছন্দে নিয়ে আসার চেষ্টা করুক। কিন্তু এর জন্য আল্লাহ্ তা'লার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অন্যথায় অন্য কোনও মহামারি, ও বিপদ এসে হানা দিবে এবং ঐশী প্রকোপে পড়তে হবে। অতএব, যতদিন এরা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি প্রত্যাবর্তন না করছে, আল্লাহ্ তা'লার অধিকার ও বান্দার অধিকার প্রদান না করছে, ততদিন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে না। এই কারণে আহমদীদেরকেও বেশি করে চেষ্টা করতে হবে, তবলীগ করতে হবে এবং মানুষকে বলতে হবে যে, পৃথিবীর পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে হলে একটিই উপায় রয়েছে। তোমরা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি নতজানু হও, তাঁর দিকে ফিরে এস এবং আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দাদের প্রাপ্য অধিকার দান কর।

প্রশ্ন: এক যুবক আহমদীয়াত, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) এর পরিধান এবং তাঁদের ব্যবহার্য্য কিছু বস্তু সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় জানতে চেয়ে হুযুর আনোয়ারকে চিঠি লেখেন। হুযুর আনোয়ার ২০২০ সালের ২৩ শে মার্চ তারিখের চিঠিতে লেখেন-

হাদীসে বিভিন্ন সাহাবাদের পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হুযুর (সা.) পাগড়ি পরিধান করতেন। হযরত জাবির (রা.)বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় প্রবেশ করার সময় পাগড়ি পরিহিত ছিলেন।

অনুরূপভাবে হযরত আমর বিন হারীস (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) লোকেদের উদ্দেশ্য ভাষণ দিলেন আর তাঁর মাথায় পাগড়ি ছিল।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) হুযুর (সা.)-এর এই সুন্নতের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন- 'আঁ হযরত (সা.) 'তাহ বন্দ'(লুঙ্গী) ও পরিধান করতেন আর তিনি 'সারাবিল'-ও (যেটিকে আমরা পায়জামা বলি) ক্রয় করেছেন এটা প্রমাণসিদ্ধ বিষয়। ..... এছাড়া টুপি, কুর্তা, চাদর এবং পাগড়ি পরিধান করার রীতিও তাঁর ছিল।'

(আল হাকাম, নম্বর-১৪, ৭ম খণ্ড, ১৭ই এপ্রিল, ১৯০৩, পৃ: ৮)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর অনুসরণযোগ্য ও মান্যবর হযরত আকস মহম্মদ মুস্তফা (রা.)এর প্রকৃত প্রেমিক, পূর্ণ আনুগত্যকারী এবং নিষ্ঠাবান দাস ছিলেন। এই কারণে তিনি আঁ হযরত (সা.)-এর রীতি মেনে পাগড়ি পরিধান করতেন।

এছাড়া হযরত মসীহ মওউদ (আ.) পাগড়ি পরিধান করার পরিবর্তে চুলের গোছা বানাতেন, এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে হুযুর (সা.)-এর পরিপূর্ণ আনুগত্য এবং তাঁর প্রতি পরম ভালবাসার প্রতিদানে উম্মতি ও ছায়া নবীর মর্যদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। নবীরা হলেন আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যাঁদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা আমাদের কর্তব্য। অতএব, নবীদের সত্তা সম্পর্কে এই ধরণের প্রশ্ন তাদের জন্য অবমাননকার হিসেবে বিবেচিত হয়।

স্বয়ংক্রিয় কলমের কথাটি অসত্য। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর কাছেও এই ধরণের কলম ছিল না, আমার কাছেও নেই। তবে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রিয় বান্দাদের সঙ্গে এমন সম্পর্ক রাখেন যে প্রত্যেকটি বিষয়ে তিনি তাদের পথপ্রদর্শন করেন। আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং তাঁর খলীফাদের প্রতিও তাঁর এমন সম্পর্ক রয়েছে।

আহমদীয়া কমিউনিটি সম্পর্কে বলতে গেলে এটি নতুন কোন ধর্ম নয়, ইসলামের প্রকৃত জামাত এটি। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা যা আল্লাহ্ তা'লা হযরত মহম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন

যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীর সংশোধন ও উন্নতির জন্য পূর্ববতী জাতিদের মাঝে বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্ন এলাকায় নবীদের আবির্ভূত করে এসেছেন এবং মানুষের পথপ্রদর্শনের জন্য তাদেরকে শিক্ষামালা দান করেছেন, অনুরূপভাবে তিনি আমাদের প্রভু হযরত মহম্মদ মুস্তফা (সা.)কে সমগ্র জগতের পথপ্রদর্শনের জন্য আবির্ভূত করেছেন এবং কিয়ামত দিবস পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত কুরআন

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: **Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura**

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

সেই ব্যক্তি মো'মেন যার হৃদয়ে ঐশী ভালবাসা উন্মাদনার ন্যায় বদ্ধমূল হয়েছে। সে সিদ্ধান্ত করেছে যে, যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট ও লাঞ্ছনাতেও খোদার সঙ্গ ত্যাগ করবে না। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩১)

দোয়াপ্রার্থী: **Qazi Abdur Rashid and Family, Basanatapur, 24 pgs(s)**

করীমের চিরন্তন শিক্ষা তাঁর উপর অবতীর্ণ করেছেন।

হুযুর (সা.) আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সংবাদ পেয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এমন এক যুগ আসবে যখন ইসলামের মধ্যে বিকৃতি তৈরী হবে, মুসলমানেরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাবে। এমন সময় আল্লাহ্ তা'লা এই উম্মতের উপর দয়াপরবশ হয়ে এর পথপ্রদর্শনের জন্য হুযুর (সা.)এর অনুসারীদের মধ্য থেকে তাঁর এক নিষ্ঠাবান দাসকে দাঁড় করাবেন যিনি মানুষকে সেই শিক্ষার উপর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন যা আল্লাহ্ তা'লা হুযুর (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ করেছিলেন এবং যিনি এর ব্যাখ্যা নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে করেছিলেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আজীবন এই দায়িত্ব পালন করেই ক্ষান্ত হন নি। তাঁর মৃত্যুর পরও হুযুর (সা.)এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে জামাত আহমদীয়ায় কল্যাণমণ্ডিত খিলাফতের ধারা সূচিত হয়েছে এবং জামাত আহমদীয়া আল্লাহ্ তা'লার ফযলে খিলাফতের ছত্রছায়ায় ইষলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা এবং এর অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা সমগ্র জগতে প্রচারে ব্রতী হয়েছে।

কাজেই জামাত আহমদীয়া মানুষের তৈরী কোন প্রতিষ্ঠান নয় যার দাগমুক্তি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে, বরং এটি খোদা তা'লার হাতে রোপিত চারাবৃক্ষ যা মানুষের কল্যাণার্থে তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা পৃথিবীতে প্রচারে সচেষ্ট রয়েছে।

পাপ ও পুণ্যের বিষয়ে আপনার প্রশ্নের উত্তর হল, ভাল ও মন্দের মাপকাঠি কি? হয়তো আপনার কাছে একটি বিষয় মন্দ কিন্তু অপরের কাছে তা ভাল। পৃথিবীতে এর একাধিক উদাহরণ পাওয়া যেতে পারে।কিন্তু ধর্মীয় জগতে সে সব বিষয় খোদা তা'লা করার নির্দেশ দিয়েছেন , সেগুলি পুণ্য আর যেগুলি নিষেধ করেছেন সেগুলি হল পাপ। ইসলামি পরিভাষায় অনুযায়ী এই বিধিনিষেধ একজন মুসলমান এই বিধিনিষেধগুলি মেনে চলবে এমন প্রত্যাশাই করা হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসুল যে সব বিষয়গুলি করার আদেশ করেছেন সেগুলি সম্পাদন করা এবং যেগুলি নিষেধ করেছেন সেগুলি থেকে বিরত থাকা। এর এই ধরণের কর্মাবলী অনুসারেই তার সঙ্গে আচরণ করা হবে।

অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সম্পর্কে বলা যায় যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তাদের মধ্যে যারা পুণ্য কর্ম সম্পাদন করেছেন, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বিনষ্ট করবেন না। পিপাসার্ত কুকুরকে এক পতিতা মহিলার জল পান করানোর কারণে আল্লাহ্ তা'লা সেই মহিলাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশাধিকার দিয়েছিলেন। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ্ তা'লা করুণাভিত্তিক গুণাবলীরও অধিকারী। তিনি যখন চান তা প্রয়োগ করার শক্তি রাখেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আবর্জনা কুড়োনোর বিষয়ে যে আপত্তি করা হয়েছে সেটি ভুল। জামাত আহমদীয়ায় এমন ধরণের কাজের জন্য 'ওয়াকারে আমল ' (সাফাই অভিযান) শব্দবন্ধন ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ এমন কাজ যা করলে মানুষের সম্মান বৃদ্ধি পায়। নিজের এলাকা ও পরিবেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা একটি সুস্থ্য অভ্যাস যার আদেশ দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল। আমি নিজেও কতবার ওয়াকারে আমলের সময় আবর্জনা কুড়িয়েছি এবং নর্দমা পরিস্কার করেছি।

পরিস্কার করা এবং আবর্জনা কুড়োলে কখনই সম্মান হানি হয় না। সম্মান আল্লাহ্র হাতে আর তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করলেই সম্মান হানি হয়। সেই কারণে সব সময় আমাদের আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলী পালন করার চেষ্টা করা উচিত।

প্রশ্ন: দৈনন্দিন ব্যবহার্য আবশ্যিক পণ্য বিক্রির সময় পণ্যের মূল্য কিস্তিতে পরিশোধকারীদের কাছ থেকে স্বাভাবিক মূল্য থেকে কিছুটা বেশি মূল্য নেওয়া কি সুদের আওতাভুক্ত নয় তো?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি ব্যবসায় ক্রেতাদেরকে আগে থাকতেই বলে দেন যে নগদে এই দাম পড়বে আর কিস্তিতে নিলে এত টাকা বেশি দিতে হবে, তাহলে এতে কোন অসুবিধে নেই, এটি সুদের মধ্যে পড়বে না। কেননা এক্ষেত্রে কিস্তিতে ক্রয়কারীদের যথারীতি হিসাব রাখতে হবে এবং কিস্তির টাকা পরিশোধ করার জন্য তাদেরকে স্মরণ করানোর প্রয়োজনও হতে পারে আর আপনার সময় ব্যয় হবে আর জাগতিক কাজকর্মের সময় ব্যয় হওয়া মূল্য রাখে। চাকুরী পেশার লোকেরা নিজেদের সময়ের বিনিময়েই মোটা মোটা বেতন নেয়।

প্রশ্ন: একটি সংবাদ পত্রিকায় এক মহিলার ঘটনা প্রকাশিত হয়েছিল, যে কিনা স্বামীর মাতাল হওয়ার কারণে তার সঙ্গে সহবাস করতে অস্বীকার করেছিল। এই ঘটনা বর্ণনা করার পর এক ভদ্রমহিলা হুযুরের কাছে জানতে চেয়েছেন যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এক পক্ষ যদি নেশাগ্রস্ত থাকে, তবে সেক্ষেত্রে কি পারস্পরিক ভালবাসার আবেগ টিকে থাকতে পারে?

হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০২০ সালের ৩০ শে মার্চ তারিখের চিঠিতে লেখেন- এমতাবস্থায় ভালবাসার আবেগ টিকে থাকার প্রশ্ন থাকে না, বরং এখানে পুণ্য প্রকৃতির প্রশ্নটিই প্রধান। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে ফেরাউনের স্ত্রীর সেই দোয়াকে আমাদের জন্য উদ্ধৃত করে আমাদের প্রদর্শন করেছেন।

رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ

এই আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, ফেরাউনের স্ত্রী ফেরাউনের কাছ থেকে পৃথক হতে বাধ্য ছিল, সেই কারণেই সে খোদা তা'লার কাছে প্রার্থনা করেছিল।

অতএব কুরআনের আয়াত থেকে প্রমাণ হয় যে, যদি কোন মোমেন মহিলার অসৎ স্বামীকে বোঝানোর পরও তার সংশোধন না হয় আর সেক্ষেত্রে স্বামীর কাছ থেকে আলাদা হতে কোন বাধা না থাকে তবে এমন মোমেন মহিলাকে দোয়া করে এমন অসৎ স্বামী থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া উচিত।

প্রশ্ন: কোরোনা ভাইরাস উদ্ভুত পরিস্থিতিতে বা-জামাত নামাযের জন্য নামাযীদের মধ্যে পরস্পর দেড় মিটার দূরত্ব রাখার বিষয়ে জার্মানীর আমীর সাহেব হুযুর আনোয়ারের নিকট পথনির্দেশনা চান।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন- আঁ হযরত (সা.)-এর বাণী 'ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত' অনুসারে ইসলামের প্রতিটি আদেশের ভিত্তি হল এর উদ্দেশ্য। বা-জামাত নামাযের জন্য নামাযীদেরকে পরস্পর কাঁধে কাঁধ, হাঁটুতে হাঁটুতে এবং গোড়ালিতে গোড়ালি মিলিয়ে দাঁড়ানোর এবং পরস্পর কোন শূন্যস্থান না রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশের পেছনে যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে তা এই যে, তোমরা যদি বাহ্যিকভাবে নিজেদের মধ্যে দূরত্ব তৈরী কর, তবে শয়তান তোমাদের মাঝে স্থান করে নিয়ে তোমাদের অন্তরসমূহে ভেদাভেদ তৈরী করবে।

এখন যেহেতু বাধ্যবাধকতা রয়েছে আর প্রশাসন নাগরিকদের স্বার্থেই এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, তাই আমরা যখন সরকারি বিধি মেনে এভাবে পরস্পরের মাঝে দূরত্ব রেখে দাঁড়াব, তখন আমাদের মাঝে মতবিরোধ তৈরী হোক বা আমাদের মধ্যে শয়তান দূরত্ব তৈরী করুক, এমন উদ্দেশ্য যেহেতু আমাদের থাকে না, বরং আমাদের উদ্দেশ্য থাকে আমরা যেন ঐক্যবদ্ধ থাকি এবং ঐক্যবদ্ধ থেকে এই মহামারির বিরুদ্ধে লড়াই করি এবং সর্বসাধারণের স্বার্থে সরকারের নেওয়া পদক্ষেপে আমরা সহযোগিত করি, তাই এই উদ্দেশ্য নিয়ে বাধ্য হয়ে ব-জামাত নামাযের সময় নামাযীদের মাঝে দূরত্ব রাখলে কোন অসুবিধে নেই। ভ্রমণরত অবস্থায় নিরুপায় হয়ে বাহনে নামায পড়ার বিষয়টির দ্বারাও এই উপসংহার বের করা যায়। কেননা, সফরেও কাঁধে কাঁধ, হাঁটুতে হাঁটু এবং গোড়ালিতে গোড়ালি মেলানো থাকে না আর অনেক সময় নামাযীদের মাঝে পরস্পর দূরত্বও থাকে। অতএব, যেভাবে ভ্রমণরত অবস্থায় বাধ্যবাধকতার কারণে এই পন্থা অবলম্বন করা আঁ হযরত (সা.)-এর সুন্নত থেকে প্রমাণিত,ঠিক সেইভাবেই এই মহামারির কারণেও নামাযীদের ব্যবধান থাকলে কোন অসুবিধে নেই।

আল্লাহ্ তা'লা রহম করুন এবং দ্রুত এই বিপদ থেকে সমগ্র পৃথিবীতে মুক্ত করুন। যাতে তাঁর ইবাদতারী বান্দারা পূর্ণ শর্ত অনুসারে এবং সুন্দরভাবে ইবাদত করার তৌফিক পায়। আমীন।

এই কারণে তিন বছর পর্যন্ত তাদের জন্য চাঁদার ব্যবস্থাপনা বলবৎ করা হয় না। তিন বছর সময়টুকু তাদের প্রশিক্ষনের সময়। জামাতের ব্যবস্থাপনা কি তা তাদেরকে বলুন, তাদেরকে বলুন যে, তোমরা এখন নতুন, তাই এগুলিকে জামাতের ব্যবস্থাপনা মনোযোগ সহকারে দেখ এবং বোঝ।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Badruddin, Neogir hat, (South 24 PGS)

আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং কুরআন মজীদের রক্ষক

-মৌলানা মহম্মদ হামীদ কওসার, নাযির দাওয়াতে ইলাল্লাহ্, দক্ষিণ ভারত

কুরআন মজীদের সুরক্ষায় জামাত আহমদীয়ার ভূমিকা।

জামাত আহমদীয়া এ যাবৎ ১০০টিরও বেশি ভাষায় সম্পূর্ণ কুরআন মজীদ বা কুরআন মজীদের নির্বাচিত আয়াতসমূহের অনুবাদ প্রকাশ করেছে। ভারতের নিম্নলিখিত ভাষায় আরবী সহ কুরআন মজীদের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

১। উর্দু ২। হিন্দি।৩। ইংরেজি। ৪। পঞ্জাবী। ৬। মালায়ালাম। ৭। ডোগরি। ৮। বাংলা। ৯। উড়িয়া। ১০। তামিল। ১১। কান্নাড়। ১২। মারাঠি। ১৩। গুজরাতি। ১৪। তেলুগু। ১৫। কাশ্মিরী।

এই অনুবাদগুলি প্রকাশের উদ্দেশ্য হল প্রত্যেক ব্যক্তি যেন অনুবাদের সাহায্যের কোনও কোনও ভাবে কুরআন করীমের অর্থ ও গূঢ় তত্ত্ব বুঝতে পারে এবং তাদের জন্য কি আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় বার্তা দেওয়া হয়েছে তা অনুধাবন করতে পারে আর হাজার হাজার মানুষ এর থেকে উপকৃত হয়।

জিহাদের বিষয়ে জামাত আহমদীয়ার ধর্মবিশ্বাস।

হযরত মহম্মদ (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, উম্মতের মহম্মদীয়ায় যে মসীহর আগমণের সুসংবাদ দিচ্ছি তিনি 'মিনকুম' অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্য থেকেই এক ব্যক্তি হবেন আর তিনিই হবেন ইমাম মাহদী। তিনি বলেছেন- 'লা-ল মাহদীউ ইল্লা ঈসা ইবনে মরিয়াম'। (সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুল ফিতন) অর্থাৎ মাহদী ভিন্ন কোন ঈসা ইবনে মরিয়ম নেই আর তিনি আগমণকারী মসীহ ও মাহদী সম্পর্কে এও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তিনি জিজিয়া কর বিলোপ করবেন। ভিন্ন রেওয়ায়েতে জিজিয়ার স্থানে 'আল-হারব'ও বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ জিহাদ বিস সাইফ' বা সশস্ত্র জিহাদকে স্থগিত করবেন। স্পষ্ট থাকে যে, আরবী শব্দ জিহাদ' 'জাহাদা' থেকে উদ্ভূত যার অর্থ পরিশ্রম করে চলা। আর জিহাদের অর্থা হল কোন কাজ সম্পাদন করতে পূর্ণ প্রচেষ্টা করা, চেষ্টায় কোনও প্রকার খামতি না রাখা। উর্দুতেও আমরা 'জাদ ও জুহাদ' শব্দ প্রায়ই ব্যবহার করে থাকি। কুরআন করীম এবং হাদীসে জিহাদের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ বর্ণিত হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

عن جابر قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غزاۃ لہ فقال لھم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم "قد متم خیر مقدم وقد متم من الجھاد الاصغر إلی الجھاد الاکبر قالو وما الجھاد الا کبر یا رسول اللہ قال مجاھدۃ العبد ھواہ۔

হযরত জাবির (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত নবী করীম (সা.) এক যুদ্ধভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনকালে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্বোধন করে বললেন- 'তোমাদের আগমণ অত্যন্ত শুভ আর তোমরা 'জিহাদে আসগর' (অর্থাৎ গৌণ জিহাদ) থেকে 'জিহাদে আসগর' (মুখ্য জিহাদ) -এর দিকে পা বাড়িয়েছ। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহ্র রসুল! 'জিহাদে আকবর' কি?' তিনি উত্তর দিলেন, 'নিজের কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে জিহাদ করা। (তারিখে বাগদাদ, যিকরু মিন ইসমুহু)

প্রথম শ্রেণীর জিহাদ সেটিই যা মানুষ নিজের বিরুদ্ধে করে। ইসলামে সব থেকে বড় জিহাদ হল মানুষের নিজেকে পাপ থেকে রক্ষা করা এবং পুণ্যকর্মে নিজেকে নিয়োজিত করা। একজন মুসলমান যখন নিজেকে পবিত্র করে নেয় এবং বাস্তবিক অর্থে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে, তখন তার জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর জিহাদ করার আদেশ রয়েছে। যেমনটি বলা হয়েছে- جَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا (সূরা ফুরকান: ৫৩) অর্থাৎ, তুমি কুরআন মজীদের শিক্ষাকে অপরের কাছে ভালবাসা ও যুক্তি প্রমাণ সহকারে পৌঁছে দাও। জামাত আহমদীয়ার অধিকাংশ সদস্য আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় দিবারাত্রি জিহাদে কবীরে নিয়োজিত রয়েছে। তৃতীয় শ্রেণীর জিহাদ হল সব থেকে ছোট জিহাদ যাকে জিহাদে আসগর বলা হয়। এটির অনুমতি কেবল তখনই দেওয়া হয় যখন মুসলমানদেরকে 'রাব্বুনাল্লাহ্' বলার কারণে অত্যাচার করা হয়। এমন পরিস্থিতিতে মুসলমানেরা যদি তবে তাদের সঙ্গে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি রয়েছে وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ (সূরা হজ্জ: ৪০) অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করার বিষয়ে পূর্ণ শক্তি রাখেন। আজকের মুসলমান এবং তাদের মৌলবীরা জিহাদের নারাধ্বনি দিয়ে নিরপরাধ মানুষদের হত্যা করছে আর হত্যা করার উস্কানি দিচ্ছে। কুরআন করীমে উল্লেখিত সেই জিহাদের সঙ্গে এর দূরতম সম্পর্ক নেই। এটি যদি কুরআন সম্মত জিহাদ হত, তবে আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই তাদেরকে স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে বিজয় দান করতেন। বিগত একশ বছরে সকল ক্ষেত্রে তাদের এমন পরাজয় এবং ভরাডুবি দ্বারা আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্ট ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, এগুলি কুরআন সম্মত জিহাদ নয়। যদি তা হত, তবে নিশ্চয় তারা বিজয় অর্জন করত। তাছাড়া সৈয়্যদানা হযরত মহম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর স্পষ্ট উক্তি রয়েছে যে, মুসলিম ও মোমেন সেই ব্যক্তি, যার হাত ও জিহ্বা থেকে মানুষের প্রাণ নিরাপদ থাকে। আজকের তথাকথিত মুসলমান ও মোমেনদের হাতে যদি কোথাও কোন নিরাপরাধ মানুষের হত্যা হয়, তবে তারাই বলুক যে রসুলুল্লাহ্ (সা.)এর এই উক্তির অর্থ কি? অতএব, প্রমাণিত হল যে, হাদীস অনুসারে মুসলমান ও মোমেন কখনই এমন কাজ করবে না। কেউ যদি করে থাকে তবে সে অবশ্যই ইসলামের বিরুদ্ধ শক্তির আঙ্গুলী হেলনে ইসলাম এবং প্রকৃত মুসলমানদের দুর্নাম করতে এই অপকর্ম করছে। একথাও সঠিক যে, বিগত শতাব্দীতে পৃথিবীর অনেক দেশ ও এলাকায় ইয়াজুজ মাজুজ এবং দাজ্জালের রাজনীতি এবং মুসলমানদের নিজেদের ভুলের পরিণামে মুসলমান জাতি অন্যান্য সকল জাতির সঙ্গে চিরন্তর বিবাদে লিপ্ত হয়েছে এবং এই ধারা আজও অব্যাহত। স্পষ্ট থাকে যে, এগুলি সবই রাজনৈতিক বিবাদ ও খুনোখুনির ঘটনা। এগুলির সঙ্গে ইসলাম তথা কুরআনের কোন সম্পর্ক নেই। কেউ যদি এগুলিকে ইসলামের সঙ্গে জুড়ে দেখে সেটি তার মস্ত ভুল। এখানে এই প্রশ্নও ওঠে যে, ইসলামর এমন শান্তিপূর্ণ শিক্ষা থাকতেও কিভাবে মুসলমানদের মাঝে জিহাদের ভুল অর্থের অনুপ্রবেশ ঘটল? ইতিহাসের গভীর অধ্যয়ন করলে এর উত্তর সহজেই পাওয়া যাবে। ইসলামের প্রারম্ভিক শতাব্দীতে ইসলামের অসাধারণ উন্নতি দেখে শত্রুরা বুঝে ফেলে যে এখন ইসলামের সঙ্গে পেরে ওঠার শক্তি আর তাদের নেই। অপরদিকে তারা ইসলামকে ধ্বংস ও নির্মূল করতে এবং এর সুনাম করতেও ব্যগ্র ছিল। তাই তারা মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে কিছু ভ্রান্ত ধর্মীয় বিশ্বাস মুসলমানদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে শুরু করে।

ইহুদী ও খৃষ্টানরা যখন দেখল যে, তওরাত ও বাইবেলে অত্যন্ত নিষ্ঠুরতাপূর্ণ ও নির্মম শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে আর এর বিপরীতে কুরআন করীমে যারপরনায় সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে। তখন তারা 'জিহাদ' শব্দটি ভুল ব্যাখ্যা করে মুসলমানদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে শুরু করে। অপরদিকে স্বার্থলোভী তথাকথিত মুসলমান বাদশাহরা নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য জিহাদের ভুল ব্যাখ্যার আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করল। তাই তারা তৎকালীন যুগের উলেমাদের দিয়ে ভুল তফসীরকেই ব্যপকহারে প্রচার করল। যার পরিণাম এই দাঁড়াল যে, আজ জিহাদের ভুল ব্যাখ্যাকেই প্রকৃত তফসীর মনে করে ইসলাম সম্পর্কে বহু ভ্রান্ত মতবাদ সৃষ্টি করা হল। এই ভ্রান্ত ধারণা এবং মতবাদগুলিকে দূর করতেই আল্লাহ্ তা'লা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) কে মসীহ মওউদ ও মাহদী তথা যুগের ইমাম করে পাঠিয়েছেন। তিনি এসে ঘোষণা করলেন-

'খোদার আদেশে আজ থেকে সশস্ত্র যুদ্ধের অবসান হল। এখন এর পর থেকে যে কাফেরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে নিজেকে গাজি বলে পরিচয় দিবে, সে সেই রসুলের অবাধ্যতা করে যিনি আজ থেকে চৌদ্দশ বছর পূর্বে বলে দিয়েছিলেন যে, মসীহ মওউদ এর আবির্ভাব ঘটলে যাবতীয় সশস্ত্র যুদ্ধের অবসান হবে। অতএব, আমার আবির্ভাবের পর কোন সশস্ত্র যুদ্ধ নেই।আমার পক্ষ থেকে শান্তি ও মীমাংসার শুভ্র ধ্বজা উড্ডীন হয়েছে। খোদা তা'লার প্রতি আহ্বানের কেবল একটিই পথ নেই। অতএব, যে পন্থা সম্পর্কে নির্বোধরা আপত্তি তুলেছে, সেই পন্থা পুনরায় অবলম্বন করা হোক তা খোদা তা'লার প্রজ্ঞা চায় না। এর উদাহরণ হল, যেভাবে যে সকল নিদর্শনকে পূর্বে অস্বীকার করা হয়েছি, আমাদের প্রিয় রসুল (সা.)-কে সেগুলি দেওয়া হয় নি।"

(রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৬, পৃ: ২৮)

واعلموا ان وقت الجھاد السیفی قد مضی ولم یبق الا الجھاد القلم و الدعاو آیات عظمی

অর্থাৎ জেনে রেখো! এখন সশস্ত্র যুদ্ধের যুগ নয়, বরং এটি হল লেখনী, দোয়া এবং বড় বড় নিদর্শনের মাধ্যমে জিহাদের যুগ।

(হাকীকাতুল মাহদী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৪, পৃ: ৪৫৭)

এখানে সংক্ষেপে আরও একটি কথার উল্লেখ করাও সমীচীন হবে। বর্তমান যুগে পৃথিবীর যে কোন স্থানে সন্ত্রাসের কোনও ঘটনা ঘটলেই আমাদের দেশসহ অন্যান্য দেশে পত্র-পত্রিকা এবং সংবাদ মাধ্যমে অবিলম্বে সেটির গায়ে ইসলামিক সন্ত্রাসের তকমা এঁটে দেওয়া যেন একটি নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন সংবাদ=পত্রিকার আচরণ দেখে অবাক হতে হয়। অন্য কোন ধর্মের মানুষ যদি ঐ একই কাজ করে, সেক্ষেত্রে তাদের কাজের ধর্মীয়করণ করা হয় না। উদাহরণ স্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি নাগাসাকি ও হিরোশিমায় পরমানবিক বোমা নিক্ষেপ করে বা যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য যৌথভাবে আফগানিস্তান ও ইরাকের উপর বোমা বর্ষন করে তবে সেটিকে খৃষ্টীয় সন্ত্রাস বলা হয় না। জেনারেল ডায়ার যদি জালিয়ানওয়ালা বাগে শত শত ভারতীয়দের গুলি করে হত্যা করে, তবু সেটিকে খৃষ্টীয় সন্ত্রাসের নাম দেওয়া হয় না।

এই স্পষ্টীকরণের পর মুষ্টিমেয় নির্বোধ মুসলমানদের পক্ষ থেকে কারো প্ররোচনায় কাউকে হত্যা করার ঘটনাকেও কোনওভাবে ইসলামের সঙ্গে যুক্ত করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

জামাত আহমদীয়ার পক্ষ থেকে জিহাদের বিষয়ে এই স্পষ্টীকরণের সঙ্গে সেই সব আয়াতের ব্যাখ্যা করা হচ্ছে যেগুলি আবেদনকারী তার আবেদনে উপস্থাপন করেছে।

(ক্রমশ...)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol-7 Thursday, 17 Feb, 2022 Issue No. 7

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

হুযুর আনোয়ার (আই.) হুযুর আনোয়ার (আই.)–এর নিউজিল্যাণ্ড সফর (সেপ্টেম্বর, ২০১৩)

২রা নভেম্বর, ২০১৩
মসজিদ বায়তুল মুকীত–এর উদ্বোধন।

সম্মানীয় অতিথিবৃন্দ!

আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু।

আজ জামাত আহমদীয়া মুসলেমা নিউজিল্যাণ্ডের জন্য অত্যন্ত আনন্দের দিন। কেননা তারা তাদের প্রথম মসজিদের উদ্বোধন করছে।মসজিদের উদ্দেশ্য কি এবং মুসলমানদের কাছে এর গুরুত্ব কতখানি, সে সম্পর্কে কিছু বলার আগে আমি সমস্ত অতিথিদেরকে ধন্যবাদ জানানো আবশ্যক মনে করি যারা আমাদের নেমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন।

ধর্মীয় ভিন্নতা সত্ত্বেও আপনাদের এখানে মসজিদ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আসা আপনাদের আলোকিত চিন্তাধারা এবং উন্মুক্ত মানসিকতার পরিচায়ক। নিঃসন্দেহে এর থেকে প্রকাশ পায় যে, আপনারা নিউজিল্যাণ্ডকে এমন এক দেশে পরিণত করতে চান যেখানে সমস্ত ধর্মের মানুষ মিলেমিশে থাকতে পারে এবং উন্নতি করতে পারে। আপনার চান যে ধর্ম নির্বিশেষে এদেশের নাগরিক হিসেবে সকলেই সমান অধিকার ভোগ করবে। এটি এক চিরন্তন সত্য যে, ধর্মের সম্পর্ক মানুষের মনের সঙ্গে, কারো মনকে কখনও ধর্ম বিশেষের উপর ঈমান আনতে বাধ্য করা যেতে পারে না। এই কারণেই কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, ধর্মের বিষয়ে কোন জোরজবরদস্তি হওয়া কাম্য নয়। এছাড়াও বর্ণিত হয়েছে যে, কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা আঁ হযরত (সা.)কে সম্বোধন করে বলেছেন, তাঁর কাজ হল শুধু ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়া। এরপর এই বাণী গ্রহণ করা বা অস্বীকার করার বিষয়ে প্রত্যেকে স্বাধীন ছিল।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এছাড়াও মদিনা হিজরতের পর আঁ হযরত (সা.) প্রশাসনিক প্রধানের পদে নির্বাচিত হন। এবং প্রশাসনিক প্রধান হিসেবেও আঁ হযরত (সা.) ইহুদীদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করেছিলেন যে চুক্তি অনুসারে তাদেরকে মদিনায় থেকে নিজেদের শরীয়ত বিধান অনুযায়ী মীমাংসা করানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ধর্মীয় স্বাধীনতার দৃষ্টিকোণ থেকে আঁ হযরত (সা.)-এর সদিচ্ছার আরও একটি উদাহরণ উপস্থাপন করছি। আঁ হযরত (সা.) তাঁর মাতৃভূমি মক্কায় যখন বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করলেন, যেখানে তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে ১৩ বছর যাবৎ অনবরত বর্বর ও পশুসুলভ অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তখন তাঁর আচরণ কতই না মহান ছিল। যে কাফেররা এই উৎপীড়ন করেছিল আঁ হযরত (সা.) শুধু তাদেরকে ক্ষমাই করেন নি। বরং বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে বললেন, যদিও সকলে ইসলামী শাসনের আওতাধীন থাকবে, কিন্তু কোন ব্যক্তিকে মুসলমান হওয়ার জন্য বাধ্য করা হবে না। বস্তুত মক্কার কিছু অমুসলিম নেতা বলেছিল যে, মক্কায় থাকতে গেলে যদি ইসলাম গ্রহণ করতে হয়, তবে তারা মক্কা ছেড়ে চলে যাবে। আঁ হযরত (সা.) তাদেরকে প্রত্যুত্তরে এই ঘোষণা করলেন, তারা নিজেদের ধর্ম মেনে চলার বিষয়ে স্বাধীন, তাদের উপর কোন চাপ দেওয়া হবে না আর কোনওভাবে বাধ্যও করা হবে না। এই কারণে ধর্মীয় বিষয়ে কখনও কোন বলপ্রয়োগ করা হত না। তবে রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য কিছু আইন-কানুন অবশ্যই তৈরী হয়েছিল, কিন্তু সকলে সেই আইন সমানভাবে মেনে চলতে বাধ্য ছিল। আর এই কারণেই আমি আজ নিউজিল্যাণ্ডের মানুষ, প্রশাসন এবং এখানে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, কেননা আপনারা আমাদের সুযোগ দিয়েছেন, মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দিয়েছেন এবং আমাদের আনন্দের শরিকও হয়েছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন অবশ্যই হৃদয়ের অনুভূতি আর আমার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা আরও জরুরী হয়ে পড়ে। কেননা আমাদের প্রিয় নবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়, সে খোদার প্রতিও কৃতজ্ঞ হতে পারে না।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমাদের ধর্মবিশ্বাস অনুসারে মসজিদ হল খোদার আবাস। এটি হল একত্রে বা দলবদ্ধভাবে খোদার উপাসনা করার স্থান। আমরা যখন এই উদ্দেশ্য নিয়ে মসজিদে একত্রিত হই, তখন কেবল খোদা তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করি না, এই কারণে যে তিনি আমাদরেকে মসজিদ নির্মাণের তৌফিক দান করেছেন। বরং আমাদের হৃদয় এতদঞ্চলের মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতার আবেগেও আপ্লুত হয় এবং তাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা ভাবের উদয় হয়। এদেরকে আমাদের অবশ্যই ধন্যবাদ জানানো উচিত। কেননা তারা সেই সময় আমাদেরকে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দিয়েছেন যখন কি না কিছু উগ্রবাদী ইসলামী সংগঠনের কার্যকলাপ পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে মুসলমানদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করেছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইসলাম-ভীতি সৃষ্টি হওয়ার কারণ হল অনেক অমুসলিম ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবগত নয়। এই কারণে উগ্রবাদী মুসলিম সংগঠনগুলির নিন্দনীয় ও জঘন্য কার্যকলাপের অস্বাভাবিক বিপুল প্রচার তাদের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছে। আর হয়তো এই কারণেই তারা মনে করে যে, যদি কোনও এলাকায় মসজিদ নির্মাণ হয়, তবে সেটি হয়ে উঠবে অশান্তি ও নৈরাজ্যের কেন্দ্র।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি স্পষ্ট ভঙ্গিতে বলছি যে, মসজিদ সম্পর্কে এমন ধারণ একেবারেই ভুল। মসজিদ আরবী শব্দ যাকে ইংরেজিতে মস্ক বলে। মসজিদের আভিধানিক অর্থ হল সিজদা-স্থল, অর্থ যেখানে মানুষ খোদার সামনে নতশির হয়। খোদার সামনে সিজদাবনত হওয়ার অর্থ তাঁর ইবাদত করা এবং তাঁর সকল আদেশ শিরোধার্য করা।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা আহমদীরা যাকে ইমাম মাহদী (পথপ্রদর্শক) হিসেবে মান্য করি, তিনি আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এই যুগে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করতে আবির্ভূত হয়েছেন। হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) ইসলামের সেই প্রকৃত শিক্ষাকে উন্মোচিত করতে এসেছেন যা কালের প্রবাহে ধূলিধুসরিত হয়ে পড়েছিল। তিনি (আ.) অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেন, তাঁর আগমণের উদ্দেশ্য সেই দূরত্বের অবসান ঘটানো যা মানুষ ও খোদার সম্পর্কের মাঝে অন্তরায় ছিল। তিনি মানবজাতিকে খোদার দিকে পথপ্রদর্শন করতে আবির্ভূত হয়েছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) এও বলেছেন যে, তাঁর আগমণের আরেকটি উদ্দেশ্য হল সকল ধর্মীয় যুদ্ধের অবসান ঘটানো। তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে সকল ধর্মের অনুসারীদের মাঝে পরস্পর বোঝাপড়া তৈরী করা যাতে তারা পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্প্রীতির স্পৃহা বজায় রেখে সহবস্থান করতে পারে। আমাদের জামাতের প্রতিষ্ঠাতা এও বলেছেন যে, তাঁর আগমণের আরও একটি উদ্দেশ্য হল মানুষকে একে অপরের অধিকার প্রদানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা। সংক্ষেপে এই যে, তিনি এমন এক সমাজ গড়তে এসেছেন যেখানে সকলে একে অপরের বৈধ অধিকার সমূহ প্রদান করবে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই জামাত আহমদীয়ার গোড়া পত্তন করা হয়েছিল। আর এই উদ্দেশ্য লাভের জন্যই জামাত আহমদীয়া মসজিদ নির্মাণ করে থাকে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আহমদীদের আশা এবং বিশ্বাস, মসজিদে এসে ইবাদত করলে তারা খোদর নৈকট্য অর্জন করবে এবং সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে যারা খোদারর বিধিনিষেধ মেনে চলে। নিশ্চয় মানুষের অধিকার প্রদান করা আল্লাহ্ তা'লার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ আদেশাবলীর মধ্যে অন্যতম। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি কুরআন করীমের শিক্ষার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করব।

ইসলাম শিক্ষা দেয়, খোদা তা'লার পর তোমাদের পিতামাতার স্থান, যারা তোমাদেরকে লালন পালন করেছেন, তাই তাদের প্রতি ভালবাসা ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করা তোমারে কর্তব্য। তারা যখন বার্ধক্যে উপনীত হয়, তখন তাদের যত্ন নেওয়া এবং চাহিদাবলী পূরণ করা তার সন্তানদের দায়িত্ব। ইসলাম এও শিক্ষা দেয় যে, যদি তোমাদের পিতামাতা বৃদ্ধ হয়, এবং বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা ও অসুস্থতার কারণে তোমাদের প্রতি রুক্ষস্বরে কথা বলে, তবে তাদেরকে ভর্ৎসনা করা তোমাদের জন্য মোটেই শোভনীয় নয়। তাদের প্রতি সামান্য অসন্তুষ্টিও প্রকাশ করা উচিত নয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এছাড়া কুরআন করীম মুসলমানদেরকে মানুষের অধিকার প্রদানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নির্দেশ দেয় যে, যারা ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত, তাদেরকে খাদ্য দাও । এরপর কুরআন করীম মুসলমানদেরকে উপদেশ দেয় যে, অনাথ ও সমাজের অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষদের প্রতি যত্নবান হও এবং তাদেরকে সাহায্য কর। এই কারণেই জামাত আহমদীয়া কোথাও প্রাকৃতিক দুর্যোগ এলে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয় ,তাদের জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা করতে স্বেচ্ছাসেবীরকে পাঠায়। কিছু দেশে জামাতের পক্ষ থেকে স্থায়ীভাবে জনকল্যাণমূলক প্রকল্প অব্যাহত রয়েছে। (ক্রমশ.....)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir